Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

শিরক বিদ'আত নির্মূলে উম্মতে মুসলিমাহর করনীয়

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফৌজিয়া সরদার

রোলঃ 228020070

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

শিরক বিদ'আত নির্মূলে উম্মতে মুসলিমাহর করনীয়

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফৌজিয়া সরদার

রোলঃ 228020070

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " শিরক বিদ'আত নির্মূলে উম্মতে মুসলিমাহর করনীয় " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফৌজিয়া সরদার, আইডিঃ 228020070 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ শিরক বিদ'আত নির্মূলে উম্মতে মুসলিমাহর করনীয় ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Fousia.

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

ফৌজিয়া সরদার

আইডিঃ 228020070

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

শির্ক

ভূমিকাঃ

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্যই, যিনি ব্যতীত আমাদের অপর কোন প্রতিপালক ও উপাস্য নেই। দরূদ ও সালাম প্রিয় রাসূল সাঃ, তাঁর পরিবার ও সাহাবীদের প্রতি, যাঁর অনুসরণ, আনুগত্য ও ভালোবাসা ব্যতীত আমাদের ইহকাল ও আখেরাতে শান্তি ও মুক্তির কোনই উপায় নেই। কেয়ামত দিবস পর্যন্ত যারা এককভাবে আল্লাহ তা'আলাকেই তাদের প্রতিপালক ও উপাস্য হিসেবে গণ্য করেন এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আল্লাহ তা'আলার সর্বশেষ রাসূল হিসেবে মনে করেন, নিঃশর্তভাবে কেবল তাঁরই আদর্শের অনুসরণ ও অনুকরণ করেন তাদের উপরেও আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।

এ পৃথিবী হচ্ছে মানুষের আখেরাতে শান্তিময় জীবন লাভের কর্ম ক্ষেত্র। আমরা রূহ জগতে থাকাকালে তিনি যেমন এ-জন্য আমাদের নিকট থেকে তাঁর রুবূবিয়্যাতের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত স্বীকৃতি নিয়েছেন, তেমনি আমাদেরকে এখানে সৃষ্টি করার সময়ও তাঁকে স্বীকৃতি দানের উপযোগী করে সৃষ্টি করেছেন। আবার যখনই মানুষেরা পারিপার্শ্বিক বিবিধ কারণে তাঁর তাওহীদ থেকে বিচ্যুত হয়ে তাঁর রুবূবিয়্যাত ও উলূহিয়্যাতে শির্কে লিপ্ত হয়েছে, তখনই তিনি তাদের হেদায়তের জন্যে যুগে যুগে প্রেরণ করেছেন নবী ও রাসূল। তাঁদের সাথে দিয়েছেন হেদায়তের অমিয় বাণী। এ ধারাবাহিকতায় বিশ্ব মানবতার হেদায়তের জন্যে সর্ব শেষ রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে। তাঁকে দিয়েছিলেন তাঁর সর্বশেষ বাণী আল-কুরআন। যার প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ তিনি করেছেন তাঁর সুন্নাতের মাধ্যমে। যারাই তাঁকে ভালবেসে নিঃশর্তভাবে এ দু'য়ের অনুসরণ ও অনুকরণ করবে, তারাই হবে সেখানে সফলকাম। কিন্তু মানুষের এ সফলতার সম্মুখে অন্তরায় হচ্ছে তাদের চির শত্রু শয়তান। আদম আলাইহিস সালাম-কে সেজদা না করার ফলে যেদিন সে আল্লাহর অভিসম্পাত প্রাপ্ত হয়েছিল, সেদিনই সে আদম সন্তানদেরকে তার মতই অভিশপ্ত করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিল। সে বলেছিল :

﴿قَالَ فَبِمَآ أَغۡوَيۡتَنِي لَأَقۡعُدَنَّ لَهُمۡ صِرَٰطَكَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ ١٦ ثُمَّ لَأٓتِيَنَّهُم مِّنۢ بَيۡنِ أَيۡدِيهِمۡ وَمِنۡ خَلۡفِهِمۡ وَعَنۡ أَيۡمَٰنِهِمۡ وَعَن شَمَآئِلِهِمۡۖ وَلَا تَجِدُ أَكۡثَرَهُمۡ شَٰكِرِينَ ١٧﴾ [الاعراف :١٦، ١٧]

''আপনি যেমন আমাকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করলেন তেমনি আমিও অবশ্য (এ আদমের সন্তানদেরকে) পথভ্রষ্ট করার জন্য আপনার সরল পথে বসে থাকব, অতঃপর তাদের সমুখ,

পশ্চাৎ, ডান ও বাম দিক থেকে তাদের কাছে আসব। আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না।'' (সুরা - আ'রাফ ১৭ ও১৮)

পাপ মূলত দু'প্রকারঃ একটি বড় আর অপরটি ছোট। আবার বড় পাপের রয়েছে অনেক প্রকার। তবে আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দৃষ্টিতে তন্মধ্যে তিনটি পাপ হচ্ছে সবচেয়ে গুরুতর। আবু বকর রাঃ নুফাই' ইবন হারিছ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

- أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟« ثَلاَثًا، قَالُوا :بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ :»الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ» وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ - أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ«، قَالَ :فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا :لَيْتَهُ سَكَتَ

''হে আমার সহচরগণ! আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় অপরাধ সম্পর্কে সংবাদ দেব''? 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাটি তিনবার বলেন। আমরা বললাম : হে আল্লাহর রাসূল আপনি বলুন।''তিনি বললেন : সবচেয়ে বড় ও মারাত্মক পাপের কাজ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া''। এ কথা বলার পর তিনি পিঠ হেলান দেয়া থেকে সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন : ''মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা''। ''তিনি এ কথাটি বারবার বলতে থাকলে আমরা মনে মনে ভাবলাম, হায় যদি তিনি নীরব হতেন।''[1]

এ-হাদীসে যে তিনটি অপরাধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তন্মধ্যে পরিণতির দিক থেকে আল্লাহ তা'আলার সাথে শির্ক করা হচ্ছে সর্বাধিক মারাত্মক অপরাধ। যারা এ অপরাধ করে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার পরিষ্কার কথা হচ্ছে- তিনি কস্মিনকালেও তাদের প্রতি করুণার দৃষ্টিতে দেখবেন না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ﴾]النساء :٤٨[

''নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে শরীক করা হলে তিনি কখনও তা ক্ষমা করেন না, (তবে) এর চেয়ে নিম্নমানের অপরাধ হলে তিনি যাকে ইচ্ছা (তা) ক্ষমা করেন।''[2]

উপর্যুক্ত আয়াতের মর্মের প্রতি লক্ষ্য করলে প্রতীয়মান হয় যে, মানুষ যে সব অপরাধ করে আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে পরিণতির দিক থেকে তন্মধ্যে শির্কই হচ্ছে সবচেয়ে মারাত্মক অপরাধ। একটি শির্কমূলক অপরাধ একজন মুসলিমের জন্য পরিণতির দিক থেকে অত্যন্ত ভয়াবহ হওয়ায় দেশের মুসলিম জনগণকে এ জঘন্য অপরাধ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবগত করানো একান্ত প্রয়োজন।

وما توفيقي إلا بالله

1.আল-বুখারী, ‘আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ঈসমাঈল, আস-সহীহ; সম্পাদনা : ড. মুস্তফা আদীব আল-বাগা, (বৈরুত : দ্বার ইবনে কাছীর আল-ইয়ামামা : ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৭ খ্রি.), কিতাবুস শাহাদাত, বাব নং ১০, হাদীস নং- ২৫১০, ২/৯৩৯ ; আল-ক্কুশাইরী, মুসলিম ইবন হাজ্জাজ, আস-সহীহ; সম্পাদনা : মুহাম্মদ ফুআদ ‘আব্দুল বাক্বী, (বৈরুত : দ্বার এহইয়াউত তুরাছিল ‘আরাবী, সংস্করণ বিহীন, সন বিহীন), কিতাবুল ঈমান, বাবু বয়ানিল কাবাইর , ১/৯৩।
2. সুরা- আন নিসা ৪৮

শির্ক শব্দের অর্থ এবং এর প্রকারভেদঃ

শির্ক শব্দের আভিধানিক অর্থ :

ইবন মানযুর বলেছেন : ‘আশ-শির্কাতু’ ও ‘আশ-শারকাতু’ (الشِرْكَةُ وَ الشَّرْكَةُ) সমার্থবোথক দু’টি শব্দ। যার অর্থ : দু’শরীকের সংমিশ্রণ। তিনি আরো বলেন : ‘ইশতারাকনা’ (اشْتَرَكْنا) আমরা শরীক হলাম শব্দের অর্থ : ‘তাশারাকনা’ (تَشَارَكْنَا) আমরা পরস্পর শরীক হলাম। দু’জন শরীক হলো আর পরস্পর শরীক হলো বা একে অপরের সাথে শরীক হলো কিংবা শরীক হওয়া, এ-সব শব্দের অর্থ ‘আল-মুশারিক’ (الْمُشَارِكُ) বা অংশীদার। ‘আশ-শির্কু’ (الشِّرْكُ) শরীক করাও শরীক হওয়ার মতই। এর বহু বচন হলো : ‘আশরাক’ ও ‘শুরাকা-উ’ ‘(أَشْرَاكٌ وَ شُرَكَاءُ) অর্থাৎ : সকল শরীকান বা অংশীদার।
তিনি আরো বলেন : ‘আশ-শির্কু’ (اَلشِّرْكُ) শব্দটি ‘আল-হিস্সাতু’ (اَلْحِصَّةُ) : অংশের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে : [مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِيْ عَبْدٍ...]’’- ‘‘যে তার কোন ক্রীতদাসের অংশকে মুক্ত করে দিল...।’’[1]
বলা হয়ে থাকে ‘‘طَرِيْقٌ مُشْتَرَكٌ’’ অর্থাৎ সম্মিলিত রাস্তা, যা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সকলের সমান অধিকার রয়েছে। ‘আশরাকা বিল্লাহি’ (أَشْرَكَ بِاللهِ) সে আল্লাহর সাথে শরীক করলো, অর্থাৎ আল্লাহর রাজত্বে কাউকে তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত করলো।[2] (নাউযু বিল্লাহি)
শেখ যাকারিয়্যা আলী ইউছুফ বলেন :

‘‘কোন ক্ষেত্রে ‘শারাকতুহু’ ও আশ-রাকতুহু’ (شَرَكْتُهُ وَ أَشْرَكْتُه) তখনই বলা হয় যখন সে ক্ষেত্রে আমি কারো ‘শরীক’ (شَرِيْكٌ) অংশীদার হয়ে গেলাম, ‘শা-রাকতুহু’ (شَارَكْتُهُ)শব্দটিও শরীক এর অর্থ প্রকাশ করে।‘আশরাকতুহু’ (أَشْرَكْتُهُ) শব্দের অর্থ: আমি তাকে শরীক করে নিলাম। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ وَأَشۡرِكۡهُ فِيٓ أَمۡرِي ٣٢ ﴾ [طه: ٣٢]

(হে আল্লাহ) ‘‘তুমি হারূনকে আমার নবুওতের অংশীদার করে দাও।’’[3]
তিনি আরো বলেন: ‘শির্ক’ শব্দমূলটি সংমিশ্রণ ও একত্রিকরণের অর্থ প্রকাশ করে। কোন বস্তুর অংশ বিশেষ যখন একজনের হবে, তখন এর অবশিষ্ট অংশ হবে অপর এক বা একাধিকজনের।
তিনি আরো বলেন : কোনো বস্তুতে একাধিক শরীক হলে সে বস্তুতে তাদের প্রত্যেকের অংশ সমান হওয়াটি অত্যাবশ্যক নয়, তাদের একের অংশ অপরের অংশের চেয়ে অধিক হওয়ার পথেও তা কোন অন্তরায় সৃষ্টি করে না, যেমন মূসা আলাইহিস সালাম তাঁর রেসালতের ক্ষেত্রে স্বীয় ভাই হারূন আলাইহিস সালামকে তাঁর সাথে শরীক করার জন্য আল্লাহ তা‘আলার নিকট আবেদন করলে আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿ قَالَ قَدۡ أُوتِيتَ سُؤۡلَكَ يَٰمُوسَىٰ ٣٦ ﴾ [طه: ٣٦]

‘‘হে মূসা! তোমার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা হলো।’’[6]

এ কথা বলে আল্লাহ তা‘আলা মূসা আলাইহিস সালাম-এর কামনা পূর্ণ করে থাকলেও রেসালতের ক্ষেত্রে হারূন আলাইহিস সালাম-কে সমান অংশীদার করে দেন নি; বরং সে ক্ষেত্রে হারূন আলাইহিস সালাম-এর অংশ মূসা আলাইহিস সালাম-এর অংশের চেয়ে কম ছিল।[7]
উপর্যুক্ত বর্ণনার আলোকে আমাদের নিকট এ-কথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, ‘শির্ক’ শব্দমূলটি মূলগতভাবেই মিশ্রণ ও মিলনের অর্থ প্রকাশ করে থাকে এবং এ মৌলিক অর্থটি এর সকল রূপান্তরিত শব্দের মধ্যে নিহিত থাকে। আর দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যকার অংশীদারিত্ব যেমন ইন্দ্রিয় অনুভূত বস্তুসমূহের মধ্যে হতে পারে[8],
তেমনি তা কোন অর্থগত বা গুণগত[9] বস্তুতেও হতে পারে।

[1]. বুখারী, প্রাগুক্ত; কিতাবুল এৎক, বাব নং ৪, হাদীস নং ২৩৮৬, ২/৮৯২; মুসলিম, প্রাগুক্ত; কিতাবুল এৎক, হাদীস নং ১৫০১, ৩/১২৮৭। [2]. ইবন মানযুর, লেছানুল ‘আরব; শব্দমূল : الشِّرْكُ, (কুম:নাশরু আদাবিল হাওযাঃ সংস্করণ বিহীন, ১৮০৫হি.), ১০/৪৪৮-৪৫০। [3]. অধ্যাপক আনতুয়ান না‘মাঃ ও গং, আল-মুনজিদ; (বৈরুতঃ দারুল মাশরিক, সংস্করণ ২১, ১৯৭২ খ্রি.), পৃ.৩৮৪। [4] . আল-কুরআন, সূরা ত্বাহা : ৩২। [5] . আল-কুরআন, সূরা আহকাফ : ৪। [6] . আল-কুরআন, সূরা ত্বাহা : ৩৬। [7]. যাকারিয়্যা আলী ইউছুফ, আল-ঈমান ওয়া আ-ছারুহু ওয়া আশশির্কু ওয়া মাযাহিরুহু; (কায়রো : মাকতাবাতুস সালাম আল- আলমিয়্যা : ২য় সংস্করণ, তারিখ বিহীন), পৃ. ৭৮। [8]. যেমন দুই বা ততোধিক ব্যক্তির কোনো বাড়ী, জমি

বা গাড়ীতে সমঅংশে বা বেশ-কমে অংশীদার হওয়া। [9]. যেমন মানুষ এবং ঘোড়া প্রাণী হওয়ার ক্ষেত্রে সমানভাবে অংশীদার এবং দু'টি ঘোড়া বাদামী বা লাল বর্ণের হওয়ার ক্ষেত্রে সমানভাবে শরীক হতে পারে।

আল্লাহ তা'আলার রুবুবিয়্যাতের বৈশিষ্ট্যসমূহঃ

রব' হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার গুণগত নাম। আর এ-গুণগত নামবাচক শব্দ থেকেই 'রুবূবিয়্যাত' শব্দটি উদগত হয়েছে। এটা 'রব' নামের সম্পর্ক বর্ণনাসূচক শব্দ। 'রব' শব্দটি আভিধানিক দিক থেকে প্রভু, মালিক, মনিব, প্রতিপালক, কর্তা, অভিভাবক ও দেবতা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

উপরে 'রব' শব্দের যে সব অর্থ বর্ণিত হয়েছে, সে সবই মূলত আল্লাহ তা'আলার 'রুবূবিয়্যাত'-এর বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত বিষয়াদি। তবে শর'য়ী পরিভাষায় আল্লাহ তা'আলাকে 'রব' বলে স্বীকৃতি দিতে হলে নিম্নে বর্ণিত বিষয়সমূহকে তাঁর রুবূবিয়্যাতের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে এবং এর বিপরীতধর্মী চিন্তা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হতে হবে :

১. তিনি আমাদের ও এ জগতের ছোট বড় সব কিছুর একক সৃষ্টিকর্তা। যেখানে যা কিছু সৃষ্টি করা প্রয়োজন, সেখানে তিনি নিজেই তাঁর পরিকল্পনানুযায়ী তা সৃষ্টি করেছেন ও করেন।

২. তিনি এ বিশ্বজগতের সব কিছুর একক মালিক, নিয়ন্ত্রক ও পরিচালক। এ ক্ষেত্রে তাঁর কোনো শরীক ও সাহায্যকারী নেই। এ-জগত পরিচালনা কর্মে তাঁর অনুমতি ব্যতীত শাফা'আতের নামে তাঁর নিকট অনধিকার চর্চা করার মতও কেউ নেই।

৩. তিনি আমাদের জীবনের ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইত্যাদি বিষয়াদি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় হেদায়াত তথা আদেশ ও নিষেধ দানের মালিক। তাঁর বিধানসমূহ বিস্তারিত ও মৌলিক নীতিমালার আকারে বর্ণিত হয়েছে কুরআনুল কারীম ও তাঁর নবীর সহীহ হাদীসে। এগুলো অবতীর্ণ করেছেন সকল স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে বাস্তবায়নের যোগ্য করে। আমরা নীতিগতভাবে তাতে বর্ণিত বিধানসমূহ মানতে বাধ্য। তাতে বর্ণিত কোনো বিধানের বিকল্প কোনো বিধান রচনা করার আমাদের কোনো বৈধ অধিকার নেই। অনুরূপভাবে কোনো বিধান রচনা করার প্রয়োজন দেখা দিলে তাতে বর্ণিত নীতিমালার বাইরে শরী'আতের উদ্দেশ্যের সাথে সাংঘর্ষিক কোনো বিধান রচনা করারও আমাদের কোনো অধিকার নেই। আমরা যদি নিজেদেরকে সেরকম কিছু করার যোগ্যতাবান বলে মনে করি, তা হলে এতে আমরা প্রকারান্তরে নিজেদেরকে নিজেদের রব বানিয়ে নেব এবং কুরআনুল কারীমের সূরা আল-

মায়িদাহ : এর ৪৪, ৪৫, ও ৪৭ আয়াতে বর্ণিত বক্তব্যের মর্মানুযায়ী আমরা এ অপরাধের কারণে ইয়াহূদীদের ন্যায় কাফির, যালেম ও ফাসিকে পরিণত হবো।

উপর্যুক্ত এ বিষয়গুলো যে আল্লাহ তা'আলার রুবূবিয়্যাতের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত বিষয়, এর প্রমাণ আমরা নিম্নে বর্ণিত আয়াতসমূহে দেখতে পাই :

ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর জাতির উপাস্য দেবতাদের সমালোচনা পূর্বক তাদের নিকট স্বীয় উপাস্য প্রভুর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছিলেন :

﴿ قَالَ أَفَرَءَيۡتُم مَّا كُنتُمۡ تَعۡبُدُونَ ٧٥ أَنتُمۡ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلۡأَقۡدَمُونَ ٧٦ فَإِنَّهُمۡ عَدُوّٞ لِّيٓ إِلَّا رَبَّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٧٧ ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهۡدِينِ ٧٨ وَٱلَّذِي هُوَ يُطۡعِمُنِي وَيَسۡقِينِ ٧٩ وَإِذَا مَرِضۡتُ فَهُوَ يَشۡفِينِ ٨٠ وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحۡيِينِ ٨١ وَٱلَّذِيٓ أَطۡمَعُ أَن يَغۡفِرَ لِي خَطِيٓـَٔتِي يَوۡمَ ٱلدِّينِ ٨٢ رَبِّ هَبۡ لِي حُكۡمٗا وَأَلۡحِقۡنِي بِٱلصَّٰلِحِينَ ٨٣ ﴾ [الشعراء :٧٥، ٨٣]

তিনি বলেন : ''তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষেরা যাদের উপাসনা করছো, তাদের যথার্থতা নিয়ে কি কোন সময় তোমরা ভেবে দেখেছ ? সমগ্র জগতের প্রতিপালক ব্যতীত এদের সবাই আমার শত্রু। সমগ্র জগতের প্রতিপালক তিনিই- যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করেন, যিনি আমাকে আহার ও পানীয় দান করেন, যখন আমি রোগাক্রান্ত হই তখন তিনিই আরোগ্য দান করেন, যিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন অতঃপর পুনর্জীবন দান করবেন, যিনি আখেরাতে আমার অপরাধ মার্জনা করবেন বলে আমি আশাবাদী, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে কর্তৃত্ব দান কর এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্গত কর।''

আল্লাহ তা'আলার উলূহিয়্যাতের বৈশিষ্ট্যঃ

'উলূহিয়্যাত' শব্দটি 'ইলাহ' শব্দমূল থেকে গৃহীত এবং এরই সম্বন্ধ জ্ঞাপক শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে- উপাস্য (مَعْبُوْدُ), যার আনুগত্য করা হয় (مَتْبُوْعُ) ও মান্যবর (مُطَاعُ)। উলূহিয়্যাতের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- যিনি উলুহিয়্যাতের মালিক হবেন তিনি অবশ্যই তাঁর উপাসকদের রব হওয়ার বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ অধিকারী হওয়ার কারণে তাদের একচ্ছত্র উপাস্য, আনুগত্য লাভের অধিকারী ও মান্যবর হবেন। আমরা পূর্বেই আল্লাহর রুবূবিয়্যাত সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে এ বিষয়টি প্রমাণ করে দেখিয়েছি যে, কারো মানুষের রব হওয়ার জন্য তাঁর যেসব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া অত্যাবশ্যক, তা মহান আল্লাহর মাঝে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান রয়েছে। কাজেই মানুষের প্রতি তাদের রবের অবদানের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাদের যাবতীয় উপাসনা ও আনুগত্য কেবল তাঁকে কেন্দ্র করেই অনুষ্ঠিত হবে। তারা বেঁচে থাকলে কেবল তাঁরই সন্তুষ্টি বিধানের জন্য বেঁচে

থাকবে, জীবন দিতে হলে কেবল তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনকে কেন্দ্র করেই দিতে হবে। প্রকাশ্য ও গোপন আল্লাহর যত রকমের উপাসনা রয়েছে তাতে সে কশ্মিনকালেও কাউকে শরীক করবে না, এ মর্মেরই একটি ইস্পাত কঠিন সংকল্প লালিত হবে প্রতিটি মুসলিমের মনের গভীরে। এ সংকল্পের প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ قُلۡ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحۡيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ١٦٢ لَا شَرِيكَ لَهُۥۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرۡتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلۡمُسۡلِمِينَ ١٦٣ ﴾]الانعام :١٦٢، ١٦

“আপনি বলুন, নিশ্চয় আমার সালাত, কুরবানী, জীবন ও মৃত্যু সবই সমগ্র জাহানের প্রতিপালক আল্লাহের জন্যেই নিবেদিত, তাঁর কোন শরীক নেই। এ ঘোষণা দেয়ার জন্যেই আমি আদিষ্ট হয়েছি, আমিই হলাম সর্বপ্রথম মুসলিম।”[1] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ সংকল্পের কথা শিক্ষা দেয়া হয়েছে তাঁর উম্মতকে তা শিক্ষা দেওয়ার জন্যেই।

উপর্যুক্ত এ আয়াতগুলো নিয়ে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, উপরে আল্লাহ তা'আলার রুবূবিয়্যাতের যেসব বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে, এর মধ্যকার সাতটি বৈশিষ্ট্যই এ আয়াতগুলোর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। যেমন ‘খালাকানী’ خَلَقَنِيۡ শব্দের দ্বারা প্রথম বৈশিষ্ট্যের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, ‘ইয়াহদ্বীনী’ يَهۡدِيۡنِيۡ শব্দের দ্বারা তৃতীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, ‘ইউত্বইমুনী ওয়া ইয়াছক্বীন’ يُطۡعِمُنِيۡ وَ يَسۡقِيۡنِ শব্দদ্বয় দ্বারা চতুর্থ বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে, ‘মারিদতু ফাহুয়া ইয়াশফীন’ ﴿مَرِضۡتُ فَهُوَ يَشۡفِيۡنِ﴾ বাক্য দ্বারা পঞ্চম বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, ‘ইউমীতুনী ওয়া ইউহয়ীন’يُمِيۡتُنِيۡ ثُمَّ يُحۡيِيۡنِ বাক্যদ্বয় দ্বারা ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্যের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, ‘আত্বমাউ আন ইয়াগফিরা লী খাত্বীআতী’ أَطۡمَعُ أَن يَّغۡفِرَ لِيۡ خَطِيۡئَتِيۡ .. এ বাক্যের দ্বারা সপ্তম বৈশিষ্ট্যের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, ‘রাববী হাবলী হুকমান’ رَبِّ هَبۡ لِيۡ حُكۡمًا.. এ বাক্যের দ্বারা অষ্টম বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ প্রসঙ্গে অন্যত্র বলেছেন :

﴿ يُدَبِّرُ ٱلۡأَمۡرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلۡأَرۡضِ ﴾]السجدة :٥[﴾

“তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত যাবতীয় বিষয়াদি পরিচালনা করেন।”[4]

1]. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান; (ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ.২৮৫। [2] যদিও বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, এ ধরনের উপাধীধারী লোকদের অস্তিত্ব কোথাও নেই। [সম্পাদক] [3]. আল-কুরআন, সূরা আশ-শু'আরা :৭৫-৮৪। [4]. আল-কুরআন, সূরা শাজদাহ ৫

আল্লাহর সিফাত সম্পর্কে মান্যবর ইমামগণের মতঃ

এ সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বলেন :

".وله يد ووجه و نفس ...فهو له صفات بلا كيف ...وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف"

‘‘আল্লাহ তা‘আলার হাত, মুখ ও আত্মা ... গুণাবলী রয়েছে, তবে এর ধরণ নির্ধারণ করা যাবে না। আর তাঁর রাগ ও সন্তুষ্টির গুণদ্বয় রয়েছে, তবে এগুলোর ধরণ ও প্রকৃতির কোনো বর্ণনা দেয়া যাবে না।’’[1]
আল্লামা ইমাম মালিক (রহ.)-কে

﴿ ٱلرَّحۡمَٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ ٥ ﴾ [طه :٥]

‘রহমান আরশের উপর ইসতেওয়া করেন’’ (উঠেন), এ আয়াতে বর্ণিত ‘ইসতেওয়া’ শব্দের অর্থ সম্পর্কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলে তিনি অপর কোনো প্রতিশব্দ দিয়ে এ শব্দের তা’বীল বা ব্যাখ্যা না করে বলেন :

".الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة"

‘‘ইস্তেওয়ার অর্থ বোধগম্য, এর প্রকৃতি অজ্ঞাত, এর প্রতি ঈমান আনয়ন ওয়াজিব, এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা বেদ‘আত।’’[2]

ইমাম শাফিঈ (রহ.) কে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন : ‘‘আমি আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি, আল্লাহর পক্ষ থেকে যে উদ্দেশ্যে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, সে গুলোর উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ঈমান এনেছি এবং তাঁর পক্ষ থেকে যে উদ্দেশ্যে আল্লাহর যে সব গুণাবলীর বর্ণনা এসেছে, আমি সেগুলোর উপরেও ঈমান রাখি।’’[3]

এ সম্পর্কে ইমাম আহমদ (রহ.) বলেন: ‘‘আল্লাহর গুণাবলীসমূহের প্রতি আমি ঈমান আনয়ন করি, এগুলো সত্য বলে বিশ্বাস করি। তবে এগুলোর আকৃতি-প্রকৃতি জানি না, এর কোনো কিছুকে আমি প্রত্যাখ্যানও করি না।’’[4]

আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী সম্পর্কে এটাই হচ্ছে মূল 'আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' এর অনুসারীদের আক্বীদা বা বিশ্বাস।

[1]. দেখুন : ইমাম আবু হানীফা (রহ.) কর্তৃক রচিত 'আল-ফিকহুল আকবার' কিতাবের ব্যাখ্যা হিসাবে লিখিত মুল্লা 'আলী ক্বারী আল-হানাফী এর 'শরহু কিতাব আল-ফিকহুল আকবার'; (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাঃ, সংস্করণ বিহীন, তারিখ বিহীন), পৃ. ৫৮-৫৯। [2]. আল-হানাফী, ইবনু আবিল ইজ্জ, শরহুল 'আক্বীদাতিত ত্বাহাবিয়্যাঃ ; (বৈরুত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৫ম সংস্করণ, তারিখ বিহীন), পৃ. ১২৮; আল-খাযিন, 'আলা উদ্দিন আলী ইবনে মুহাম্মদ, তাফছীরুল খাযিন; (লাহোর : নু'মানী কুতুবখানা , সংস্করণ বিহীন, তারিখ বিহীন), ১/১০০। [3]. 'আব্দুল আযীয আল-মুহাম্মদ আস-সালমান, প্রাগুক্ত; পৃ. ২৪। [4]. তদেব।

উপরে আল্লাহ তা'আলার উলূহিয়্যাত, রুবূবিয়্যাত,গুণাবলী সম্পর্কে যা আলোচিত হলো এর দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার অনেক নাম ও গুণাবলী রয়েছে। এর সাথে তাঁর সৃষ্টির কারো কোনো নামের বা গুণের বাহ্যিকভাবে মিল থাকতে পারে, তবে এ মিল থাকাটা উভয়ের নামের ও গুণের অর্থ ও প্রকৃতির দিক থেকে কোনো অবস্থাতেই এক ও অভিন্ন বা সাদৃশ্যপূর্ণ নয়; বরং উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য রয়েছে, যা বর্ণনা করে বুঝাবার মত কোনো উপায় নেই। কারণ, সৃষ্টি আর স্রষ্টা কোনো দিন এক হতে পারে না এবং স্রষ্টার নামের ও গুণের যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তিনি তাঁর কোনো সৃষ্টিকে কোনো দিন সে বৈশিষ্ট্যের অধিকারীও করেন না, কোন সৃষ্টি নিজ প্রচেষ্টায়ও সে বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারে না। আল্লাহর এ সব নাম ও গুণাবলীর যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সে বৈশিষ্ট্য গুণেই তিনি আমাদের ও সমগ্র জগতের একমাত্র রব বা প্রতিপালক।

শির্কের বাহনঃ

এমন কিছু কথা ও কাজ রয়েছে যা সরাসরি শির্ক না হলেও রাসূল (সা.) নিজ উম্মতকে তা করতে ও বলতে নিষেধ করেছেন। কারণ, তা যে কোন ব্যক্তিকে অতিসত্বর শির্কের দিকে পৌঁছিয়ে দেয়। সে কথা ও কাজগুলো নিম্নরূপ:

১. রাসূল (সা.) এমন শব্দ উচ্চারণ করতে নিষেধ করেছেন যা সৃষ্টি ও স্রষ্টার মাঝে সমতা বুঝায়। যেমন: এমন বলা যে, আপনি ও আল্লাহ্ তা'আলা চেয়েছেন বলে কাজটি হয়েছে। নতুবা হতো না। আপনি ও আল্লাহ্ তা'আলা ছিলেন বলে ঘটনাটি ঘটেনি। নতুবা ঘটে যেতো। ইত্যাদি ইত্যাদি।

২. নবী (সা.) কারোর কবরকে নিয়ে যে কোন ধরনের বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। যেমন: কবরের উপর বসা, কবরের উপর ঘর বানানো, পাকা করা, মোজাইক করা, চুনকাম করা, কবরস্থানে বা কবরের দিকে ফিরে নামায পড়া, কবরকে যে কোন ধরনের ইবাদাত বা মেলা ক্ষেত্র বানানো, কবরের মাটির সাথে অন্য কিছু বাড়ানো, কবরকে উঁচু করা ইত্যাদি ইত্যাদি।

আবুল্ হাইয়াজ্ আসাদী (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: 'আলী (রা.) একদা আমাকে বললেন:

أَلاَ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِيْ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ؟ أَنْ لاَ تَدَعَ تِمْثَالًا وَلاَ صُوْرَةً إِلاَّ طَمَسْتَهَا، وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَوَّيْتَهُ

‘‘আমি কি তোমাকে এমন কাজে পাঠাবো না যে কাজে আমাকে রাসূল (সা.) পাঠিয়েছেন?! তুমি কোন মূর্তি বা ছবি পেলে তা মুছে দিবে এবং কোন উঁচু কবর পেলে তা সমান করে দিবে’’।

(মুসলিম, হাদীস ৯৬৯ আবু দাউদ, হাদীস ৩২১৮ তিরমিযী, হাদীস ১০৪৯ নাসায়ী : ৪/৮৮-৮৯ আহমাদ্ : ১/৯৬, ১২৯ হা'কিম : ১/৩৬৯)

বাকি প্রমাণগুলো মূল আলোচনায় আসবে।

৩. নবী (সা.) সূর্য উঠা ও ডুবার সময় নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। কারণ, তাতে সূর্য পূজারীদের সাথে মিল পাওয়া যায়।

’উক্ববাহ্ বিন্ ’আমির জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيْهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا، حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِيْنَ يَقُوْمُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ حَتَّى تَمِيْلَ الشَّمْسُ، وَحِيْنَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوْبِ حَتَّى تَغْرُبَ

“তিনটি সময় এমন যে, রাসূল (সা.) আমাদেরকে সে সময়গুলোতে নামায পড়তে অথবা মৃত ব্যক্তিকে দাফন করতে নিষেধ করেছেন। সূর্য উঠার সময় যতক্ষণ না তা পূর্ণভাবে উঠে যায়। ঠিক দুপুর বেলায় যতক্ষণ না তা মধ্যাকাশ থেকে সরে যায়। সূর্য ডুবার সময় যতক্ষণ না তা সম্পূর্ণরূপে ডুবে যায়”। (মুসলিম, হাদীস ৮৩১)

৪. রাসূল (সা.) সাওয়াবের আশায় তিনটি মসজিদ তথা মসজিদে হারাম (মক্কা মসজিদ), মসজিদে নববী (মদীনা মসজিদ), মসজিদে ’আক্বসা (বায়তুল মাক্বদিস) ছাড়া অন্য কোথাও সফর করতে নিষেধ করেন।

এর প্রমাণ মূল আলোচনায় আসবে।

৫. রাসূল (সা.) পূজা মন্ডপে অথবা মেলা ক্ষেত্রে মানত পুরা করতে নিষেধ করেছেন। কারণ, তাতে মূর্তি পূজারীদের সাথে মিল পাওয়া যায়।

এর প্রমাণ মূল আলোচনায় আসবে।

৬. রাসূল (সা.) তাঁর সম্মান ও প্রশংসায় যে কোন ধরনের বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ শিখ্খীর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি বনু ’আ’মির গোত্রের এক প্রতিনিধি দলের সাথে রাসূল (সা.) এর নিকট গেলাম। অতঃপর আমরা রাসূল (সা.) কে সম্বোধন করে বললাম: আপনি আমাদের সাইয়েদ! রাসূল (সা.) বললেন: সাইয়েদ হচ্ছেন আল্লাহ্ তা’আলা। আমি নই। তখন আমরা বললাম: আপনি আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও প্রতিপত্তিশীল! তখন তিনি বললেন:

قُوْلُوْا بِقَوْلِكُمْ أَوْ بَعْضِ قَوْلِكُمْ ، وَلاَ يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ

‘‘তোমরা এমন কিছু বলতে পারো। তবে মনে রাখবে যে, শয়তান যেন তোমাদেরকে নিজ কাজের জন্য প্রতিনিধি বানিয়ে না নেয়’’। (আবু দাউদ, হাদীস ৪৮০৬)

যদিও কোন উপযুক্ত ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তাকে সাইয়েদ বলা যায় তবুও রাসূল (সা.) তাঁর ব্যাপারে তা বলতে এ জন্যই নিষেধ করেছেন যে, যেন কেউ তাঁর সম্মান ও প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করে তাঁকে আল্লাহ্ তা’আলার সমপর্যায়ে বসিয়ে না দেয় যা বড় শির্কের অন্তর্গত।

এ কারণেই কেউ কারোর নিকট রাসূল (সা.) এর পরিচয় দিতে চাইলে তিনি তাকে শুধু তাঁর ব্যাপারে এতটুকুই বলতে আদেশ করেছেন যে, তিনি আল্লাহ্ তা’আলার বান্দাহ্ ও তদীয় রাসূল।

’উমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি নবী (সা.) কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন:

لاَ تُطْرُوْنِيْ كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُوْلُوْا :عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ

‘‘তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে কখনো বাড়াবাড়ি করোনা যেমনিভাবে বাড়াবাড়ি করেছে খ্রিষ্টানরা ’ঈসা বিন্ মার্য়াম্ (আ.) এর ব্যাপারে। আমি কেবল আল্লাহ্ তা’আলার বান্দাহ্। সুতরাং তোমরা আমার ব্যাপারে বলবেঃ তিনি আল্লাহ্ তা’আলার বান্দাহ্ এবং তদীয় রাসূল’’। (বুখারী, হাদীস ৩৪৪৫, ৬৮৩০)

৭. রাসূল (সা.) কারোর সম্মুখে তার প্রশংসা করতে নিষেধ করেছেন। যাতে তার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করা না হয় এবং সেও আত্মম্ভরিতা থেকে বেঁচে থাকতে পারে।

এমনকি রাসূল (সা.) কাউকে কারোর সম্মুখে প্রশংসা করতে দেখলে তার চেহারায় বালি ছুঁড়ে মারতে নির্দেশ দিয়েছেন।

মু’আবিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন:

إِيَّاكُمْ وَالتَّمَادُحَ فَإِنَّهُ الذَّبْحُ

‘‘তোমরা একে অপরের প্রশংসা করা থেকে দূরে থাকো। কারণ, সম্মুখ প্রশংসা হচ্ছে কাউকে জবাই করার শামিল’’। (ইবনু মাজাহ্, হাদীস ৩৮১১)

আবু বাক্রাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: জনৈক ব্যক্তি নবী (সা.) এর সম্মুখে অন্য জনের প্রশংসা করছিলো। তখন নবী (সা.) প্রশংসাকারীকে উদ্দেশ্য করে বলেন:

،وَيْحَكَ !قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ مِرَارًا، إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا صَاحِبَهُ لاَ مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ :أَحْسِبُ فُلاَنًا، وَاللهُ حَسِيْبُهُ، وَلاَ أُزَكِّيْ عَلَى اللهِ أَحَدًا، أَحْسِبُهُ، إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ كَذَا وَكَذَا

''তুমি ধ্বংস হও! তুমি ওর ঘাড় ভেঙ্গে দিয়েছো। তুমি ওর ঘাড় ভেঙ্গে দিয়েছো। এ কথা রাসূল (সা.) কয়েক বার বলেছেন। তবে যদি তোমাদের কেউ অবশ্যই কারোর প্রশংসা করতে চায় তাহলে সে যেন বলেঃ আমি ধারণা করছি, তবে আল্লাহ্ তা'আলাই ভালো জানেন। আমি তাঁর উপর কারোর পবিত্রতা বর্ণনা করতে চাই না। আমি ধারণা করছি, সে এমন এমন। সে ওব্যক্তির ব্যাপারে ততটুকুই বলবে যা সে তার ব্যাপারে ভালোভাবেই জানে''। (বুখারী, হাদীস ২৬৬২, ৬০৬১ মুসলিম, হাদীস ৩০০০ আবু দাউদ, হাদীস ৪৮০৫ ইবনু মাজাহ্, হাদীস ৩৮১২)

হাম্মাম (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা জনৈক ব্যক্তি 'উসমান (রা.) এর সম্মুখে তাঁর প্রশংসা করলে মিক্বদাদ (রা.) তার চেহারায় মাটি ছুঁড়ে মারেন এবং বলেন: রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন:

إِذَا رَأَيْتُمُ الْـمَدَّاحِيْنَ فَاحْثُوْا فِيْ وُجُوْهِهِمُ التُّرَابَ

''যখন তোমরা প্রশংসাকারীদেরকে দেখবে তখন তোমরা তাদের মুখে মাটি ছুঁড়ে মারবে''।

(মুসলিম, হাদীস ৩০০২ আবু দাউদ, হাদীস ৪৮০৪ ইবনু মাজাহ্, হাদীস ৩৮১০)

৮. রাসূল (সা.) কোন নেক্কার বান্দাহ্'র ব্যাপারে যে কোন ধরনের বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি এ জাতীয় লোকদেরকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তাঁর সর্ব নিকৃষ্ট সৃষ্টি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: উম্মে হাবীবা ও উম্মে সালামা (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) নবী (সা.) এর নিকট একদা ইথিওপিয়ার এক গীর্জার কথা বর্ণনা করেন। যাতে অনেক ধরনের ছবি টাঙ্গানো ছিলো। তখন নবী (সা.) তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন:

،إِنَّ أُوْلَائِكَ إِذَا كَانَ فِيْهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوْا فِيْهِ تِلْكَ الصُّوَرَ أُوْلَائِكَ شِرَارُ الْـخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

‘‘ওরা এমন যে, ওদের মধ্যে কোন নেক্কার ব্যক্তির মৃত্যু হলে তারা তার কবরের উপর মসজিদ বানিয়ে নেয় এবং তাতে এ জাতীয় ছবি অঙ্কন করে। ওরা কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা’আলার নিকট সর্ব নিকৃষ্ট সৃষ্টি হিসেবে পরিগণিত হবে’’। (বুখারী, হাদীস ৪২৭, ১৩৪১, ৩৮৭৩ মুসলিম, হাদীস ৫২৮)

মূলতঃ নেক্কার লোকদের প্রতি আমাদের শরীয়ত সম্মত দায়িত্ব হলো এই যে, আমরা তাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করবো। তাদের জন্য আল্লাহ্ তা’আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবো। তাদের প্রতি কোন ধরনের বিদ্বেষ পোষণ করবো না এবং কোন ধরনের বাড়াবাড়ি ব্যতিরেকে তাদের যে কোন নেক আমল কোর’আন ও হাদীস সম্মত হলে তা আমরা মেনে নেবো।

আল্লাহ্ তা’আলা বলেন:

«وَالَّذِيْنَ جَآؤُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ ، وَلاَ تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِيْنَ آمَنُوْا، رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ»

‘‘যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলেঃ হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে এবং যারা আমাদের পূর্বে খাঁটি ঈমান নিয়ে মৃত্যু বরণ করেছে তাদেরকে ক্ষমা করুন। হে প্রভু! আমাদের অন্তরে যেন কোন ঈমানদারের প্রতি সামান্যটুকু হিংসে-বিদ্বেষও না থাকে। নিশ্চয়ই আপনি পরম দয়ালু ও অত্যন্ত মেহেরবান’’। (হাশ্র : ১০)

৯. রাসূল (সা.) ছবি তুলতে নিষেধ করেছেন। কারণ, ছবি তোলাই ছিলো মূর্তিপূজার প্রথম পর্যায়। শয়তান ইবলিস সর্ব প্রথম নূহ (আ.) এর সম্প্রদায়কে তাদের নেক্কারদের ছবি এঁকে তাদের মজলিসে স্থাপন করতে পরামর্শ দেয়। যাতে করে তাদেরকে স্মরণ করা যায় এবং ইবাদাতের ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করা যায়। পরবর্তীতে সে ছবিগুলোর পূজা শুরু হয়ে যায় এবং তারা কারোর লাভ বা ক্ষতি করতে পারে এমনও মনে করা হয়। এ পরিণতির কথা চিন্তা করেই রাসূল (সা.) ছবি তুলতে নিষেধ করেছেন এবং ছবি উত্তোলনকারীরাই কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি ভোগ করবে।

’আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সা.) ইরশাদ করেনঃ

أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُضَاهُوْنَ بِخَلْقِ اللهِ

‘‘কিয়ামতের দিন সর্ব কঠিন শাস্তির অধিকারী হবে ওরা যারা আল্লাহ্ তা’আলার সৃষ্টির ন্যায় কোন কিছু বানাতে চায়’’। (বুখারী, হাদীস ৫৯৫৪ মুসলিম, হাদীস ২১০৭ বাগাওয়ী, হাদীস ৩২১৫ নাসায়ী : ৮/২১৪ বায়হাক্বী : ২৬৯)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস’ঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি নবী (সা.) কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন:

إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْـمُصَوِّرُوْنَ

‘‘নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা’আলার নিকট সর্ব কঠিন শাস্তির অধিকারী হবে ওরা যারা (বিনা প্রয়োজনে) ছবি তোলে বা তৈরি করে’’।

(বুখারী, হাদীস ৫৯৫০ মুসলিম, হাদীস ২১০৯)

’আব্দুল্লাহ্ বিন্ ’আববাস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন:

كُلُّ مُصَوِّرٍ فِيْ النَّارِ ، يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُوْرَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ فَتُعَذِّبُهُ فِيْ جَهَنَّمَ

‘‘প্রত্যেক ছবিকার জাহান্নামী। প্রত্যেক ছবির পরিবর্তে তার জন্য একটি করে প্রাণী ঠিক করা হবে যে তাকে সর্বদা জাহান্নামের মধ্যে শাস্তি দিতে থাকবে’’। (মুসলিম, হাদীস ২১১০)

’আব্দুল্লাহ্ বিন্ ’আববাস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন: আমি মুহাম্মাদ (সা.) কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন:

مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً فِيْ الدُّنْيَا كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّوْحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ

‘‘যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন ছবি এঁকেছে কিয়ামতের দিন তাকে এ ছবিগুলোতে রূহ্ দিতে বলা হবে। কিন্তু সে কখনোই তা করতে পারবে না’’। (বুখারী, হাদীস ২২২৫, ৫৯৬৩, ৭০৪২ মুসলিম, হাদীস ২১১০ বাগাওয়ী, হাদীস ৩২১৯ নাসায়ী : ৮/২১৫ ইবনু আবী শাইবাহ্ : ৮/৪৮৪-৪৮৫ আহমাদ: ১/২৪১, ৩৫০ ত্বাবারানী/কাবীর, হাদীস ১২৯০০)

’আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন:

إِنَّ أَصْحَابَ هٰذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَـهُمْ :أَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ، وَإِنَّ الْـمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ الصُّوْرَةُ

‘‘নিশ্চয়ই এ সকল ছবিকারদেরকে কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি দেয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে: তোমরা যা বানিয়েছো তাতে জীবন দাও। কিন্তু তারা কখনো তা করতে পারবে না। নিশ্চয়ই ফিরিশ্তারা এমন ঘরে প্রবেশ করে না যে ঘরে ছবি রয়েছে’’।

(বুখারী, হাদীস ২১০৫, ৫৯৫৭ মুসলিম, হাদীস ২১০৭)

আবু হুরাইরাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন: আল্লাহ্ তা’আলা বলেন:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِيْ، فَلْيَخْلُقُوْا حَبَّةً، وَلْيَخْلُقُوْا ذَرَّةً، وَلْيَخْلُقُوْا شَعِيْرَةً

‘‘ও ব্যক্তির ন্যায় জালিম আর কেউ হতে পারে না? যে আমার সৃষ্টির ন্যায় কোন কিছু বানাতে চায়। মূলতঃ সে কখনোই তা করতে পারবে না। যদি সে তা করতে পারবে বলে দাবি করে তাহলে সে যেন একটি দানা, একটি অণু-পরমাণু এবং একটি যব বানিয়ে দেখায়’’।

(বুখারী, হাদীস ৫৯৫৩, ৭৫৫৯ মুসলিম, হাদীস ২১১১ বায়হাক্বী : ৭/২৬৮ বাগাওয়ী, হাদীস ৩২১৭ ইবনু আবী শাইবাহ্ : ৮/৪৮৪ আহমাদ্ : ২/২৫৯, ৩৯১, ৪৫১, ৫২৭)

শির্কের প্রকারভেদঃ

শর‘য়ী দৃষ্টিকোণ থেকে শির্ককারীর পরিণতি বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, শির্ক মূলত তিন প্রকার :

প্রথম প্রকার : শির্কে আকবার বা বড় শির্ক

শির্কে আকবার এর সংজ্ঞা :

বিশ্বাস জাতীয় বিষয়াদি ও উপাসনার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা‘আলার সাথে কাউকে শরীক বা সমান করাই মূলত শির্কে আকবার। কুরআনুল কারীমে উপাসনা কেন্দ্রিক শির্ক সম্পর্কে অধিক আলোচনা হওয়ার কারণে অনেকে শির্কে আকবারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে এটাকে শুধু উপাসনার সাথেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। যেমন-

কেউ এর সংজ্ঞা প্রদান প্রসঙ্গে বলেন : ‘‘শির্কে আকবার হচ্ছে : আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, যেমন- অন্যকে আহ্বান করা, অন্যের নিকট কিছু কামনা করা, অন্যকে ভয় করা, অন্যকে আল্লাহর ন্যায় ভালোবাসা, অন্যের জন্য পশু উৎসর্গ বা মানত করা।’’

কেউ আরো সংক্ষেপ করে বলেছেন : ‘‘আল্লাহর সাথে গায়রুল্লাহকে আহ্বান করাই হচ্ছে শির্কে আকবার।’’

কেউ বলেন : ‘‘আল্লাহর উপাসনাসমূহের কোনো উপাসনা গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে করাকে শির্কে আকবার বলা হয়।’’[1] তবে যেহেতু শির্কে আকবার কেবলমাত্র উপাসনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে তা আল্লাহর রুবূবিয়্যাতের মধ্যেও হয়ে থাকে, সে জন্য আমার মতে এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ হওয়া উচিত :

‘‘আল্লাহ তা‘আলার নামাবলী ও গুণাবলীর যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যে বৈশিষ্ট্যগুণে তিনি আমাদের একক রব ও উপাস্য, আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা কোনো অলি দরবেশ, জিন-পরী বা গ্রহ ও তারকা, গাছ-পালা ও পাথর ইত্যাদিকে সে সব বৈশিষ্ট্যের কোনো না কোনো বৈশিষ্ট্যের সমান বা আংশিক অধিকারী বলে মনে করা এবং নবী, অলী, গাছ-পালা ও পাথর ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে মুখ, শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও অন্তর দ্বারা উপাসনামূলক কোনো কর্ম করাকে শির্কে আকবার বলা হয়।’’

শির্কে আকবারকারীর পরিণতি :

পরিণতির দিক বিবেচনা করে এ শির্ককে বড় শির্ক বলা হয়। কেননা, তা শির্ককারীকে ইসলাম থেকে সম্পূর্ণভাবে বের করে দেয়। কারণ; তা একটা প্রকাশ্য কুফরী কাজ। যেমন- কুরআনুল কারীমে আল্লাহ বলেন :

﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنۡ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحۡنُ فِتۡنَةٞ فَلَا تَكۡفُرۡۖ﴾ [البقرة :١٠٢]

"তাঁরা (হারূত ও মারূত) কাউকে এ কথা বলেই জাদু শিক্ষা দিতেন যে, আমরা তোমাদের জন্য ফেতনা বিশেষ, সুতরাং তোমরা তা শিক্ষা করে কুফরী করো না।"[2]

আমরা বাহ্যত দেখতে পাচ্ছি যে, এ আয়াতে জাদু শিক্ষা করাকে কুফরী কাজ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে; এটা এ জন্যে যে, তা নিজ থেকে মানুষের অকল্যাণ করতে পারে এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে শিক্ষা করা শির্কের অন্তর্গত কাজ। অনুরূপভাবে হাদীসে কুদসীতে দেখতে পাওয়া যায় যে, তারকার প্রভাবে বৃষ্টিপাত হয় বলে বিশ্বাস করা শির্কী বিশ্বাস হওয়া সত্ত্বেও এটিকে কুফরী বলে গণ্য করা হয়েছে।

মানুষেরা যাতে এ ধরনের শির্ক করা থেকে সতর্ক হয়, সে জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর প্রতি এই বলে সতর্কবাণী দিয়েছেন :

﴿لَئِنۡ أَشۡرَكۡتَ لَيَحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٦٥﴾ [الزمر :٦٥]

"তুমি যদি শির্ক কর, তবে তোমার যাবতীয় 'আমল ভষ্ম করে দেয়া হবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্গত হয়ে যাবে।"[5]

শির্কের পরিণতি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ ভাবে সতর্ক করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর উম্মতকে এ সম্পর্কে সতর্ক করা। তাদেরকে এ কথা জানিয়ে দেয়া যে, তারা যদি বুঝে বা না বুঝে কোনো শির্কী বিশ্বাস পোষণ করে বা কোন শির্কী কর্ম করে, তা হলে তাদের সালাত, সাওম, হজ্জ, যাকাতসহ জীবনের অন্যান্য যাবতীয় সৎকর্ম আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণ মূল্যহীন হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় প্রকার : শির্কে আসগার বা ছোট শির্ক

শির্কে আসগার এর সংজ্ঞা দান প্রসঙ্গে কোনো কোনো মনীষী বলেছেন : "শির্কে আকবার নয় এমন যে-সব কর্মকে শরী'আতের 'নস' অর্থাৎ সুস্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা শির্ক বলে নামকরণ করা হয়েছে, সেগুলোই হচ্ছে শির্কে আসগার। যেমন- কেউ যদি বলে : (ماشاء الله و شئت)'আল্লাহ

আর আপনি যা চান', (و لو الله و أنت) আল্লাহ আর আপনি যদি উপস্থিত না থাকতেন তা হলে আমার মহা বিপদ হয়ে যেতো'। অনুরূপভাবে আল্লাহ ব্যতীত অপর কারো নামে শপথ করা ইত্যাদি।''[8]

ড. ইব্রাহীম বুরাইকান এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন : ''আমলের ক্ষেত্রে গায়রুল্লাহকে আল্লাহ তা'আলার সমান করে নেয়াকে শির্কে আসগর বলা হয়, যেমন- কোন কাজে বা কথায় লোক দেখানোর ভাব করা।''[9]
ইমাম ইবন কাইয়্যিম আল জাওযিয়্যাঃ (৬৯১-৭৫১হিঃ) শির্কে আসগার এর উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেনঃ ''উপাসনায় লোক দেখানো ভাব করা, মানুষের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করা, আমি আল্লাহ ও আপনার উপর ভরসা করেছি এমনটি বলা, আল্লাহ ও আপনি না হলে এমনটি হতো। এ সব উদাহরণ প্রদানের পর তিনি বলেনঃ শির্কে আসগার কখনও কর্তা ব্যক্তির মানসিক অবস্থা ও উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে শির্কে আকবারেও রূপান্তরিত হতে পারে।''[10]

আমার মতে 'শির্কে আসগার'এর সংজ্ঞা হলো : ''এমন সব কথা বা কাজ বাহ্যিকভাবে গায়রুল্লাহকে আল্লাহ তা'আলার সাথে সমান করে নেয়া হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়, যদিও এই সমান করাটি প্রকৃতপক্ষে কর্তাব্যক্তির উদ্দেশ্য নয়।''

[1]. 'আব্দুল 'আযীয আল-মুহাম্মদ আস-সালমান, প্রাগুক্ত; পৃ. ১৭০। [2]. আল-কুরআন, সূরা বাক্বারাহ: ১০২। [3]. আল-কুরআন, সূরা যুমার : ৬৫। [4]. আস-শায়খ 'আব্দুল আযীয আস-সালমান, প্রাগুক্ত; পৃ. ১৭০। [5]. ড. ইব্রাহীম আল-বুরাইকান, প্রাগুক্ত; পৃ.১২৬। [6]. আশ-শায়খ সুলাইমান ইবন 'আব্দিল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবদিল ওয়াহহাব, তাইসীরুল 'আযীযিল হামীদ ফী শরহে কিতাবিত তাওহীদ; (বৈরুত : আল-মাকতবুল ইসলামী, ১ম সংস্করণ, ১৪০২হি.), পৃ.৪৫; আস-শায়খ আব্দুল 'আযীয আস-সালমান, প্রাগুক্ত; পৃ.১৭০-১৭১।

শির্কে আকবার ও শির্কে আসগার এর মধ্যে পার্থক্যঃ

শির্কে আকবার ও আসগারের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ-

১. অপরাধের দিক থেকে শির্কে আকবার সবচেয়ে বড় অপরাধের অন্তর্গত। আর শির্কে আসগার সাধারণ কবীরা গুনাহের অন্তর্গত।

২. শির্কে আকবার কর্তাব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বহিষ্কার করে দেয়। সে নিজেকে মুসলিম বলে দাবী করে থাকলেও বা ধর্মীয় কাজ-কর্ম করলেও আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দৃষ্টিতে সে মুসলিম থাকতে পারে না। কিন্তু শির্কে আসগার কর্তাব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বহিষ্কার করে না।

৩. একটি শির্কে আকবার মু'মিনের অতীতের যাবতীয় নেক আমল ধ্বংস করে দেয়। শির্কে আসগার শুধু সংশ্লিষ্ট আমলকেই ধ্বংস করে। অন্য আমলকে নয়।

৪. শির্কে আকবার থেকে তওবা করতে না পারলে তা কর্তাব্যক্তিকে চিরস্থায়ী জাহান্নামের অধিবাসী করে দেয়। সে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ তা'আলার ক্ষমার অযোগ্য হয়ে যায়। আর শির্কে আসগার থেকে তাওবা না করলেও তা আল্লাহ তা'আলার ক্ষমাযোগ্য অপরাধ।

৫. শির্কে আকবার থেকে তাওবা না করলে এবং নতুন করে ইসলামে প্রবেশ না করলে ইসলামী আদালতের রায় অনুযায়ী কর্তাব্যক্তির জীবন ও সম্পদের কোনো নিরাপত্তা থাকবে না। তবে শির্কে আসগারের কর্তাব্যক্তি ফাসিক মু'মিন হওয়ার কারণে ইসলামী রাষ্ট্রের কাছে তার জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা থাকবে।

বড় শির্কের প্রকারভেদঃ

১. আহবানের শির্ক: আহবানের শির্ক বলতে পুণ্যার্জন বা মানুষের সাধ্যের বাইরে এমন কোন পার্থিব লাভের আশায় অথবা এমন কোন পার্থিব ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাউকে আহবান করাকে বুঝানো হয়।

সকল আহবান একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই জন্য এবং তা গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদাত। যা তিনি ছাড়া অন্য কারোর জন্য ব্যয় করা জঘন্যতম শির্ক। তবে মানুষের সাধ্যের বাইরে নয় এমন কোন সহযোগিতার জন্য সক্ষম যে কোন ব্যক্তিকে আহবান করা যেতে পারে। এতদ্সত্ত্বেও এ সকল ব্যাপারে মানুষের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হওয়া ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَأَنَّ الْـمَسَاجِدَ للهِ فَلاَ تَدْعُوْا مَعَ اللهِ أَحَدًا

"নিশ্চয়ই মসজিদসমূহ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে ডাকার পাশাপাশি অন্য কাউকে ডেকো না"।

(জিন : ১৮)

২. ফরিয়াদের শির্ক: ফরিয়াদের শির্ক বলতে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাউকে সাহায্যের জন্য আহবান করাকে বুঝানো হয়। যে ধরনের সাহায্য সাধারণত একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কেউ করতে সক্ষম নয়। যেমন: রোগ নিরাময় বা নৌকোডুবি থেকে উদ্ধার ইত্যাদি।

এ জাতীয় ফরিয়াদ গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদাত যা আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর জন্য ব্যয় করা জঘন্যতম শির্ক।

যে কোন সঙ্কট মুহূর্তে সাহায্যের জন্য ফরিয়াদ করা হলে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই সে ফরিয়াদ শুনে থাকেন এবং তদনুযায়ী বান্দাহ্কে তিনি সাহায্য করেন। অন্য কেউ নয়।

আল্লাহ্ তা' তা'আলা বলেন:

«إِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ»

‘‘স্মরণ করো সেই সংকট মুহূর্তের কথা যখন তোমরা নিজ প্রভুর নিকট কাতর স্বরে প্রার্থনা করেছিলে তখন তিনি তোমাদের সেই প্রার্থনা কবুল করেছিলেন’’। (আনফাল্ : ৯)

৩. আশ্রয়ের শির্ক: আশ্রয়ের শির্ক বলতে যে কোন অনিষ্টকর বস্তু বা ব্যক্তির অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা’আলা ব্যতীত অন্য কারোর শরণাপন্ন হওয়াকেই বুঝানো হয়।

আল্লাহ্ তা’আলার নিকট এ জাতীয় কোন আশ্রয় কামনা করা গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদাত যা তিনি ছাড়া অন্য কারোর জন্য ব্যয় করা জঘন্যতম শির্ক। তবে যে আশ্রয় মানব সাধ্যাধীন তা সক্ষম যে কারোর নিকট চাওয়া যেতে পারে। তবুও এ ব্যাপারে কারোর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হওয়া ছোট শির্কের অন্তর্ভুক্ত।

শয়তানের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা’আলা তাঁর নিকটই আশ্রয় চাওয়ার নির্দেশ দেন।

তিনি বলেন:

«وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ»

‘‘যদি শয়তান তোমাকে কুমন্ত্রণা দিয়ে প্ররোচিত করতে চায় তাহলে তুমি একমাত্র আল্লাহ্ তা’আলারই আশ্রয় চাবে। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ’’। (ফুস্সিলাত/হা-মীম আসসাজদাহ্ : ৩৬)

৪. আশা বা বাসনার শির্ক: আশা বা বাসনার শির্ক বলতে মানুষের অসাধ্য এমন কোন বস্তুত একমাত্র আল্লাহ্ তা’আলা ব্যতীত অন্য কারোর নিকট কামনা করাকে বুঝানো হয়। যেমন: কবরে শায়িত পীর-বুযুর্গের নিকট স্বামী বা সন্তান কামনা করা।

এ জাতীয় বাসনা গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদাত যা আল্লাহ্ তা’আলা ছাড়া অন্য কারোর জন্য ব্যয় করা জঘন্যতম শির্ক।

তবে কোন পুণ্যকর্ম সম্পাদন না করে আল্লাহ্ তা’আলার রহমত ও জান্নাতের আশা করাও কিন্তু অমূলক।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

«إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، أُوْلاَئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَةَ اللهِ، وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ»

''নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্ তা'আলার উপর ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত ও আল্লাহ্'র পথে জিহাদ করেছে সত্যিকারার্থে তারাই একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহের প্রত্যাশী। তিনি ক্ষমাশীল ও করুণাময়''। (বাক্বারাহ্ : ২১৮)

৫. রুকু, সিজ্দাহ্, বিনম্রভাবে দাঁড়ানো বা নামাযের শির্ক: রুকু, সিজ্দাহ্, সাওয়াবের আশায় কোন ব্যক্তি বা বস্তুর সামনে বিনম্রভাবে দাঁড়ানো বা নামাযের শির্ক বলতে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর জন্য এ সকল গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাতগুলো ব্যয় করাকে বুঝানো হয়।

এ ইবাদাতগুলো একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্যই করতে হয়। অন্য কারোর জন্য নয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

«يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوْا الْـخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ»

''হে ঈমানদারগণ! তোমারা রুকূ, সিজ্দাহ্, তোমাদের প্রভুর ইবাদাত এবং সৎকর্ম সম্পাদন করো। যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো''। (হাজ্জ: ৭৭)

৬. তাওয়াফের শির্ক: তাওয়াফের শির্ক বলতে একমাত্র কা'বা শরীফ ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর তাওয়াফ করাকে বুঝানো হয়।

সাওয়াবের আশায় কোন বস্তুর চতুষ্পার্শ্বে তাওয়াফ করা গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদাত যা আল্লাহ্ তা'আলার মর্জি ছাড়া অন্য কারোর জন্য ব্যয় করা জঘন্যতম শির্ক। অতএব তা শরীয়ত সমর্থিত হতে হবে। ইচ্ছে করলেই কোন মাজার তাওয়াফ করা যাবেনা।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

«وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ»

''তারা যেন প্রাচীন গৃহ (কা'বা শরীফ) তাওয়াফ করে''। (হাজ্জ : ২৯)

৭. জবাইয়ের শির্ক:জবাইয়ের শির্ক বলতে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারোর নৈকট্য লাভের জন্য যে কোন পশু জবাই করাকে বুঝানো হয়। চাই তা আল্লাহ্ তা'আলা'র নামেই জবাই করা হোক বা অন্য কারোর নামে। চাই তা নবী, ওলী, বুযুর্গ বা জিনের নামেই হোক বা অন্য কারোর নামে।

সাওয়াবের আশায় কোন পশু জবাই করা গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদাত যা আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর জন্য ব্যয় করা জঘন্যতম শির্ক।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

«قُلْ إِنَّ صَلاَتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْـمُسْلِمِيْنَ»

''আপনি বলে দিন: আমার নামায, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও মরণকালের সকল নেক আমল সারা জাহানের প্রভু একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই, আমি এরই জন্যে আদিষ্ট হয়েছি এবং আমিই আমার উম্মতের সর্বপ্রথম মুসলমান''।

(আন্'আম : ১৬২-১৬৩)

৮. মানতের শির্ক:মানতের শির্ক বলতে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর জন্য কোন কিছু মানত করাকে বুঝানো হয়।

যে কোন উদ্দেশ্য সফলের জন্য কোন কিছু মানত করা গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদাত। যা আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর জন্য ব্যয় করা জঘন্যতম শির্ক।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নেক বান্দাহদের গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

«يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ»

''তাদের বৈশিষ্ট্য হলো: তারা তাদের মানত পূরা করে''। (ইন্সান/দাহর : ৭)

৯. আনুগত্যের শির্ক :আনুগত্যের শির্ক বলতে বিনা ভাবনায় তথা শরীয়তের গ্রহণযোগ্য কোন প্রমাণ ছাড়াই হালাল, হারাম, জায়েয, নাজায়েযের ব্যাপারে আলেম, বুযুর্গ বা উপরস্থ কারোর সিদ্ধান্ত অন্ধভাবে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেয়াকে বুঝানো হয়।

এ জাতীয় আনুগত্য গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদাত যা আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর জন্য ব্যয় করা জঘন্যতম শির্ক।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

«اِتَّخَذُوْا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ وَالْـمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوْا إِلاَّ لِيَعْبُدُوْا إِلَـهًا وَّاحِدًا، لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ»

''তারা আল্লাহ্ তা'আলাকে ছেড়ে নিজেদের আলিম, ধর্ম যাজক ও মার্ইয়ামের পুত্র মাসীহ্ ('ঈসা) (আ.) কে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে। অথচ তাদেরকে শুধু এতটুকুই আদেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই ইবাদাত করবে। তিনি ব্যতীত সত্যিকার কোন মা'বূদ নেই। তিনি তাদের শির্ক হতে একেবারেই পূতপবিত্র''। (তাওবাহ্: ৩১)

১০. তাওয়াক্কুল বা ভরসার শির্ক: তাওয়াক্কুল বা ভরসার শির্ক বলতে মানুষের অসাধ্য ব্যাপারসমূহ সমাধানে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর উপর ভরসা করাকে বুঝানো হয়। যেমন: রিযিক দান, সমস্যা দূরীকরণ ইত্যাদি। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা করা গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদাত যা অন্য কারোর জন্য ব্যয় করা মারাত্মক শির্ক।

তবে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাত না করে তাঁর উপর যে কোন বিষয়ে ভরসা করাও কিন্তু অমূলক।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

«فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ»

''সুতরাং আপনি আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাত করুন এবং তাঁর উপর ভরসা করুন। আপনার প্রভু কিন্তু আপনাদের কর্ম থেকে গাফিল নন''। (হূদ: ১২৩)

১১. সুপারিশের শির্ক: সুপারিশের শির্ক বলতে আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর নিকট পরকালের সার্বিক মুক্তির জন্য গ্রহণযোগ্য কোন সুপারিশ কামনা করাকে বুঝানো হয়।

এ জাতীয় সুপারিশের অনুমতি বা মঞ্জুরির চাবিকাঠি একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার হাতে। অতএব তিনি ছাড়া অন্য কারোর নিকট তা কামনা করা মারাত্মক শির্ক।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

«قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا»

"(হে নবী!) আপনি বলে দিন: যাবতীয় সুপারিশ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই জন্য তথা তাঁরই ইখতিয়ারে। অন্য কারোর ইখতিয়ারে নয়"। (যুমার : ৪৪)

১২. সাহায্য প্রার্থনার শির্ক: সাহায্য প্রার্থনার শির্ক বলতে মানুষের সাধ্যের বাইরে এমন কোন সাহায্য একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর নিকট কামনা করাকে বুঝানো হয়।

এ জাতীয় সাহায্য একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার নিকটই কামনা করতে হয়। অন্য কারোর নিকট নয়।

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে প্রতি নামাযে এ বাক্যটি বলতে শিখিয়েছেন:

«إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ»

"আমরা আপনারই ইবাদাত করি এবং আপনারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি"। (ফাতি'হা : ৫)

১৩. একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার ঘর মসজিদ ছাড়াও অন্য কোন মাজার বা কবরে অবস্থান তথা সেখানকার খাদিম হওয়া যায় এমন মনে করার শির্ক: আল্লাহ্ তা'আলা কোর'আন মাজীদের মধ্যে সাওয়াবের নিয়্যাতে একমাত্র তাঁর ঘর মসজিদে অবস্থান তথা ই'তিকাফ করার অনুমতি দিয়েছেন। অন্য কোথাও নয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

«وَعَهِدْنَآ إِلَى إِبْراهِيْمَ وَإِسْمَاعِيْلَ أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ»

‘‘আমি ইব্রাহীম ও ইসমাঈল (আলাইহিমাস্ সালাম) থেকে এ বলে অঙ্গীকার নিয়েছি যে, তোমরা আমার ঘরকে তাওয়াফকারী, ই’তিকাফকারী এবং রুকু ও সিজ্দাহ্কারীদের জন্যে পবিত্র রাখো’’। (বাক্বারাহ্ : ১২৫)

আবু হুরাইরাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন:

لَأَنْ يَّجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَّجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ

‘‘তোমাদের কারোর জন্য জ্বলন্ত কয়লার উপর বসা খুবই উত্তম কোন কবরের উপর বসার চাইতে। যদিও জ্বলন্ত কয়লার উপর বসলে তার কাপড় জ্বলে শেষ পর্যন্ত তার শরীরের চামড়াও জ্বলে যাবে তবুও’’। (মুসলিম, হাদীস ৯৭১)

কবরের খাদিমরা সরাসরি কবরের উপর না বসে থাকলেও কবরের উপর বসার ন্যায়ই। কারণ, কবরের পাশেই তাদের অবস্থান এবং কবরকে নিয়েই তাদের সকল ব্যস্থতা। সুতরাং উক্ত হাদীস তাদের ব্যাপারে প্রযোজ্য হওয়া একেবারেই অবাঞ্ছিত নয়।

১৪. একমাত্র আল্লাহ্ তা’আলার ঘর মসজিদ ছাড়াও অন্য কোন মাজার বা কবরে অবস্থান তথা সেখানকার খাদিম হওয়া যায় এমন মনে করার শির্ক:

আল্লাহ্ তা’আলা কোর’আন মাজীদের মধ্যে সাওয়াবের নিয়্যাতে একমাত্র তাঁর ঘর মসজিদে অবস্থান তথা ই’তিকাফ করার অনুমতি দিয়েছেন। অন্য কোথাও নয়। আল্লাহ্ তা’আলা বলেন:

«وَعَهِدْنَآ إِلَى إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمَاعِيْلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ»

‘‘আমি ইব্রাহীম ও ইসমাঈল (আলাইহিমাস্ সালাম) থেকে এ বলে অঙ্গীকার নিয়েছি যে, তোমরা আমার ঘরকে তাওয়াফকারী, ই’তিকাফকারী এবং রুকু ও সিজ্দাহ্কারীদের জন্যে পবিত্র রাখো’’। (বাক্বারাহ্ : ১২৫)

আবু হুরাইরাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন:

لَأَنْ يَّجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَّجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ

‘‘তোমাদের কারোর জন্য জ্বলন্ত কয়লার উপর বসা খুবই উত্তম কোন কবরের উপর বসার চাইতে। যদিও জ্বলন্ত কয়লার উপর বসলে তার কাপড় জ্বলে শেষ পর্যন্ত তার শরীরের চামড়াও জ্বলে যাবে তবুও’’। (মুসলিম, হাদীস ৯৭১)

কবরের খাদিমরা সরাসরি কবরের উপর না বসে থাকলেও কবরের উপর বসার ন্যায়ই। কারণ, কবরের পাশেই তাদের অবস্থান এবং কবরকে নিয়েই তাদের সকল ব্যস্থতা। সুতরাং উক্ত হাদীস তাদের ব্যাপারে প্রযোজ্য হওয়া একেবারেই অবাঞ্ছিত নয়।

১৫. একমাত্র আল্লাহ্ তা’আলা ছাড়াও অন্য কোন নবী-ওলী অথবা অন্য কোন পীর-বুযুর্গ সব কিছু শুনতে বা দেখতে পান এমন মনে করার শির্ক:
একমাত্র আল্লাহ্ তা’আলাই সব কিছু দেখতে বা শুনতে পান। তা যতই ক্ষুদ্র বা সূক্ষ্ম হোকনা কেন এবং যতই তা অদৃশ্য বা অস্পষ্ট হোক না কেন।

আল্লাহ্ তা’আলা বলেন:

«وَمَا تَكُوْنُ فِيْ شَأْنٍ، وَمَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، وَلاَ تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا إِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ، وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِيْ الْأَرْضِ وَلاَ فِيْ السَّمَآءِ وَلاَ أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرَ إِلاَّ فِيْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ»

‘‘হে রাসূল (সা.)! তুমি যে কোন অবস্থায়ই থাকোনা কেন অথবা কোর’আন মাজীদের যে কোন আয়াতই পড়োনা কেন এমনকি তোমরা (নবী ও তাঁর সকল উম্মত) কোন্ কাজ কোন্ সময় করো তা সবই আমি জানি। আকাশ ও পৃথিবীতে একটি ছোট লাল পিপীলিকা (অণু) সমপরিমাণ অথবা তার থেকেও ক্ষুদ্র বা বড় যে পরিমাপেরই হোক না কেন কোন বস্তুই তোমার প্রভুর অগোচরে নয়। বরং তা সুস্পষ্ট কিতাব তথা লাওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ রয়েছে’’। (ইউনুস : ৬১)

আল্লাহ্ তা’আলা আরো বলেন:

«وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لاَ تَأْتِيْنَا السَّاعَةُ، قُلْ بَلَى وَرَبِّيْ لَتَأْتِيَنَّكُمْ، عَالِمِ الْغَيْبِ، لاَ يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِيْ السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِيْ الْأَرْضِ وَلاَ أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرُ إِلاَّ فِيْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ»

‘‘কাফিররা বলে: আমাদের উপর কিয়ামত আসবে না। হে নবী! আপনি ওদেরকে বলে দিন: আমার প্রভুর কসম খেয়ে বলছি: কিয়ামত অবশ্যই আসবে। তিনি অদৃশ্য সম্পর্কে সম্যক অবগত। আকাশ ও পৃথিবীতে একটি ছোট পিপীলিকা সমপরিমাণ অথবা তার থেকেও ক্ষুদ্র বা

বড় যে পরিমাপেরই হোকনা কেন কোন বস্তুই তাঁর অগোচরে নয়। বরং তা সুস্পষ্ট কিতাব তথা লাওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ রয়েছে''। (সাবা : ৩)

উপরোক্ত আলোচনায় আমরা জেনেছি বড় শির্ক বা শির্কে আকবারের প্রকার। কিন্তু আমাদের সমাজে এগুলো ছাড়াও আরো অসংখ্য শির্কে আকবার রয়েছে। যা বিশদভাবে আলোচনার প্রয়োজন।

এখন আমরা আলোচনা করবো ছোট শির্কের প্রকারভেদ নিয়ে ইনশাআল্লাহ। ছোট শির্ক আবার ২ প্রকার ক. প্রকাশ্য শির্ক ও খ. অপ্রকাশ্য শির্ক।

নিম্নে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ

ছোট শির্কের প্রকারভেদঃ

ক. প্রকাশ্য শির্ক- প্রকাশ্য শিরক বলতে সে সকল কথা ও কাজকে বুঝানো হয় যা সবাই চোখে দেখতে পায় অথবা কানে শুনতে পায় অথবা অনুভব করতে পারে। তা আবার কয়েক প্রকার:

১. সুতা বা রিং পরার শির্ক: সুতা বা রিং পরার শির্ক বলতে কোন বালা-মুসীবত দূরীকরণ বা প্রতিরোধের জন্য দম করে গেরো দেয়া সুতা বা রিং পরিধান করাকে বুঝানো হয়।

২. ঝাঁড় ফুঁকের শির্ক:
ঝাঁড় ফুঁকের শির্ক বলতে এমন মন্ত্র পড়ে ঝাঁড় ফুঁক করাকে বুঝানো হয় যে মন্ত্রের মধ্যে শির্ক রয়েছে।

যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমার স্বামী 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্‌উদ (রা.) একদা আমার গলায় একটি সুতো দেখে বললেন: এটি কি? আমি বললাম: এটি মন্ত্র পড়া সুতো। এ কথা শুনা মাত্রই তিনি তা খুলে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেন। অতঃপর বললেন: নিশ্চয়ই আব্দুল্লাহ্'র পরিবার শির্কের কাঙ্গাল নয়। বরং ওরা যে কোন ধরনের শির্ক হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। তিনি আরো বললেন: রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন:

إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ، قَالَتْ :قُلْتُ :لِمَ تَقُوْلُ هَذَا؟ وَاللهِ لَقَدْ كَانَتْ عَيْنِيْ تَقْذِفُ، وَكُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى فُلاَنٍ الْيَهُوْدِيِّ يَرْقِيْنِيْ، فَإِذَا رَقَانِيْ سَكَنَتْ !فَقَالَ عَبْدُ اللهِ :إِنَّمَا ذَاكَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ؛ كَانَ يَنْخَسُهَا بِيَدِهِ، فَإِذَا رَقَاهَا كَفَّ عَنْهَا؛ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكِ أَنْ تَقُوْلِيْ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ :أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ، اِشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا

‘‘নিশ্চয়ই ঝাঁড় ফুঁক, তাবিজ কবচ ও ভালোবাসা সৃষ্টির জন্য ব্যবহার্য বস্তু শির্ক। যায়নাব বললেন: আমি বললাম: আপনি এরূপ কেন বলছেন? আল্লাহ্’র কসম! আমার চোখ উঠলে ওমুক ইহুদীর নিকট যেতাম। অতঃপর সে মন্ত্র পড়ে দিলে তা ভালো হয়ে যেতো। তখন ’আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্উদ (রা.) বলেন: এটি শয়তানের কাজ। সেই নিজ হাতে তোমার চোখে খোঁচা মারতো। অতঃপর যখন মন্ত্র পড়ে দেয়া হতো তখন সে তা বন্ধ রাখতো। তোমার এতটুকু বলাই যথেষ্ট ছিলো যা রাসূল (সা.) বলতেন। তিনি বলতেন: হে মানুষের প্রভু! আপনি আমার রোগ নিরাময় করুন। আপনি আমাকে সুস্থ করুন। কারণ, আপনিই একমাত্র সুস্থতা দানকারী। আপনার নিরাময়ই সত্যিকার নিরাময়। যার পর আর কোন রোগ থাকে না’’। (আবু দাউদ, হাদীস ৩৮৮৩ ইবনু মাজাহ্, হাদীস ৩৫৯৬)

৩. যাদুর শির্ক: যাদুর শির্ক বলতে এমন কতোগুলো মন্ত্র বা অবোধগম্য শব্দসমষ্টিকে বুঝানো হয় যা যাদুকর নিজ মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে থাকে। আবার কখনো কখনো বিভিন্ন ওষুধ, সুতায় গিরা বা ধুনা দিয়েও যাদু করা হয়।

এগুলো সব শয়তানের কাজ। তবে আল্লাহ্ তা’আলার ইচ্ছায় কখনো কখনো তা কারো কারোর অন্তরে বা শরীরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। যদ্দরুন কেউ কেউ কখনো কখনো অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং কারো কারোকে এরই মাধ্যমে হত্যা করা হয়। আবার কখনো কখনো এরই কারণে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহ সৃষ্টি হয়। আরো কতো কি।

৪. গণনার শির্ক: গণনার শির্ক বলতে যে কোন পন্থায় বা যে কোন বিষয়ে আগাম ভবিষ্যদ্বাণী করাকে বুঝানো হয়।

এর মূল হচ্ছে ঐশী বাণী চুরি। অর্থাৎ জিনরা কখনো কখনো ফিরিশ্তাদের কথা চুরি করে গণকদের কানে পৌঁছিয়ে দেয়। অতঃপর গণকরা এর সাথে আরো শত শত মিথ্যা কথা জুড়িয়ে মানুষকে বলে বেড়ায়। তাই তাদের কথা কখনো কখনো সত্য প্রমাণিত হয়।

৫. আল্লাহ্ তা’আলার নিয়ামত অস্বীকার করার শির্ক: আল্লাহ্ তা’আলার নিয়ামত অস্বীকার করার শির্ক বলতে যে কোন নিয়ামত একমাত্র আল্লাহ্ তা’আলার দান বা অনুগ্রহ বলে স্বীকার

না করে তা নিজ বা অন্য কারোর কৃতিত্বের সুফল অথবা নিজ মেধা বা যোগ্যতার পাওনা বলে দাবি করাকে বুঝানো হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

« يَعْرِفُوْنَ نِعْمَةَ اللهِ ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُوْنَ »

''তারা আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ সম্পর্কে জেনেও তা অস্বীকার করে। আসলে তাদের অধিকাংশই কাফির''। (নাহল : ৮৩)

৬. আল্লাহ্ তা'আলা এবং তুমি না চাইলে কাজটা হতোনা এমন বলার শির্ক: এ জাতীয় কথা বলা ছোট শির্ক।

'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم :مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ، فَقَالَ :أَجَعَلْتَنِيْ لِلَّهِ نِدًّا؟ بَلْ مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ

''জনৈক ব্যক্তি নবী (সা.) কে উদ্দেশ্য করে বললেন: আল্লাহ্ তা'আলা এবং আপনি চেয়েছেন বলে কাজটি হয়েছে। নতুবা হতো না। তখন নবী (সা.) বললেন: তুমি কি আমাকে আল্লাহ্ তা'আলার শরীক বানাচ্ছো? এমন কথা কখনো বলবে না। বরং বলবে: একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই চেয়েছেন বলে কাজটি হয়েছে। নতুবা হতো না।

(আহমাদ : ১/২১৪, ২২৪, ২৮৩, ৩৪৭ বুখারী/আদাবুল্ মুফরাদ্, হাদীস ৭৮৩ নাসায়ী/আমালুল্ ইয়াওমি ওয়াল্লাইলাহ্, হাদীস ৯৮৮ বায়হাক্বী : ৩/২১৭ ত্বাবারানী/কাবীর, হাদীস ১৩০০৫, ১৩০০৬ আবু নু'আইম/হিল্ইয়াহ্ : ৪/৯৯)

৭. আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর নামে কসম খাওয়ার শির্ক: একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর নামে কসম খাওয়া ছোট শির্ক।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নিশ্চয়ই আমি রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি। তিনি ইরশাদ করেন:

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ ؛ فَقَدْ أَشْرَكَ

''যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর কসম খাবে সে মুশরিক হয়ে যাবে''।

(আবু দাউদ, হাদীস ৩২১৫ তিরমিযী, হাদীস ১৫৩৫ ইবনু হিব্বান/মাওয়ারিদ, হাদীস ১১৭৭ হা'কিম : ১/১৮, ৫২ ৪/২৯৭ বায়হাক্বী : ১০/২৯ আব্দুর রাযযাক : ৮/১৫৯২৬ ত্বায়ালিসী, হাদীস ১৮৯৬ আহমাদ : ২/৩৪, ১২৫)

খ.অপ্রকাশ্য শির্কঃ

অপ্রকাশ্য শির্ক বলতে এমন সব ব্যাপারকে বুঝানো হচ্ছে যা চোখে দেখা যায় না অথবা কানে শুনা যায়না অথবা অনুভব করা যায় না।

অপ্রকাশ্য শির্ক আবার তিন প্রকার। যা নিম্নরূপ:

১. নিয়্যাতের শির্ক:

নিয়্যাতের শির্ক বলতে কোন নেক আমল একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্যে না করে শুধুমাত্র দুনিয়া কামানোর উদ্দেশ্যে করাকে বুঝানো হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْـحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لاَ يُبْخَسُوْنَ، أُوْلآئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَـهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ، وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

''যারা পার্থিব জীবন ও উহার সাজসজ্জা চায় আমি তাদের কৃতকর্মের ফল পূর্ণভাবে দুনিয়াতেই দিয়ে দেবো। এতটুকুও তাদেরকে কম দেয়া হবে না। এরা এমন যে, আখেরাতে তাদের জন্য জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। তাদের সকল আমল তখন অকেজো এবং নিষ্ফল বলে বিবেচিত হবে''। (হূদ: ১৫, ১৬)

২. কারোর সন্তুষ্টি কামনার শির্ক: কারোর সন্তুষ্টি কামনার শির্ক বলতে কোন নেক আমল একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য না করে অন্য কারোর সন্তুষ্টির জন্য করাকে বুঝানো হয়। যে কোন নেক আমল একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যই করতে হয়। অন্য কারোর

জন্যে নয়। সুতরাং কোন নেক আমল একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কারোর সন্তুষ্টির জন্য করা হলে তা হবে মারাত্মক শির্ক।

কোর'আন মাজীদে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি কামনাকারীদেরকেই সফলকাম বলা হয়েছে। অন্য কাউকে নয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

فَاٰتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلَ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْـهَ اللهِ، وَأُوْلآئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

''অতএব আত্মীয়-স্বজন, অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকে তাদের প্রাপ্য দিয়ে দাও। এ কাজটি সর্বোত্তম ওদের জন্যে যারা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি কামনা করে এবং ওরাই সত্যিকার সফলকাম''। (রূম : ৩৮)

৩. কাউকে দেখানো বা শুনানোর শির্ক: কাউকে দেখানো (রিয়া) বা শুনানো (সুম্'আহ্) এর শির্ক বলতে কোন নেক আমল করার সময় তা কাউকে দেখানো বা শুনানোর উদ্দেশ্যে করাকে বুঝানো হয়। যাতে মানুষের প্রশংসা কুড়ানো যায়।

কোন নেক আমল লুক্কায়িতভাবে করার পর পুনরায় তা কাউকে জানিয়ে দেয়াও এ শির্কের অন্তর্গত।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

قُلْ إِنَّمَآ أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحَى إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلاَهُكُمْ إِلاَهٌ وَّاحِدٌ، فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا، وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

''আপনি বলে দিন: নিশ্চয়ই আমি তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ। তবে আমার প্রতি এ প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের মা'বূদই একমাত্র মা'বূদ। সুতরাং যে ব্যক্তি তার প্রভুর সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার প্রতিপালকের ইবাদাতে কাউকে যেন শরীক না করে''। (কাহ্ফ : ১১০)

উপরোক্ত আলোচনায় আমরা ছোট শির্কের কিছু প্রকারভেদ সম্পর্কে জেনেছি। কিন্তু এগুলো ছাড়াও আমাদের সমাজে প্রতিনিয়ত অনেক ছোট শির্কের প্রচলন দেখা যায়। এসবক্ষেত্রেও আমাদের সচেতন হতে হবে।

বিদাত

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীন।

মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় কর এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) না হয়ে মরো না। (সূরা আলে ইমরান ১০২ আয়াত)

“হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তা থেকে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাদের দুজন থেকে বহু নর-নারী বিস্তার করেছেন এবং আল্লাহকে ভয় কর যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞ্ঞা কর এবং অজ্ঞাতি-বন্ধন ছিন্ন করাকে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ দৃষ্টি রাখেন। (সুরা নিসা ১ আয়াত)।

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল; তাহলে তিনি তোমাদের কর্মসমূহকে ত্রুটিমুক্ত করবেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করবেন। যারা আল্লাহ ও তদীয় রসুলের আনুগত্য করে তারা অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে।” (সুরা আহযাব ৭০-৭১ আয়াত)। আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাঁর বান্দাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে আদেশ করেছেন এবং অনৈক্য ও আপোস-বিরোধিতা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন,

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

অর্থাৎ, তোমরা সকলে আল্লাহর রশি (দ্বীন ও কুরআন)কে শক্ত করে ধর এবং পরস্পর বিছিন্ন হয়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর, তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, তিনি

তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন। ফলে তোমরা তাঁর অনুগ্রহে পরস্পর ভাই-ভাই হয়ে গেলে। তোমরা অগ্নিকুন্ডের (জাহান্নামের) প্রান্তে ছিলে, অতঃপর তিনি তা থেকে তোমাদেরকে উদ্ধার করেছেন। এরূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য নিদর্শন স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন, যাতে তোমরা সৎপথ পেতে পার। (সূরা আলে ইমরান ১০৩ আয়াত)

কিতাব ও সুন্নাহর মতামত ছাড়া অন্য কোন মতবাদের দিকে আহবানকারী প্রবৃত্তি, দোযখের দিকে আহবানকারী মানুষ শয়তানের অনুসরণ করতে মুসলিমকে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন কিতাব ও সুন্নাহরই অনুসরণ করতে, কেবল ঐ দুটিকেই জীবন-সংবিধানরূপে গ্রহণ ও ধারণ করতে সে আদিষ্ট হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, মানুষের পরিত্রাণ ও সফলতা কেবল ঐ দুয়ের অনুসরণেই আছে। আল্লাহর রসূল ঐ বলেন, "তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি, তা যদি তোমরা শক্তভাবে ধারণ কর, তবে কোন দিন পথভ্রষ্ট হবে না; আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাহ।" (মুআত্তা মালেক ইত্যাদি)। এই বাণীতে নবী করীম (সা.) কিতাব ও সুন্নাহর অনুসারীর জন্য সুপথ প্রাপ্তি এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সর্বনাশী পথভ্রষ্টতা হতে রক্ষার যামানত নিয়েছেন। যেমন অন্য দিকে আল্লাহর দ্বীনে বিদআত রচনা করতে কঠোরভাবে নিষেধ ও সতর্ক করেছেন এবং সারা উম্মতকে স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে, আল্লাহর দ্বীনে যে কোন বিদআত পথভ্রষ্টতার কারণ।

সাহাবী ইরবায বিন সারিয়াহ (রাঃ) বলেন, (একদা) আল্লাহর রসুল ঐ আমাদেরকে এমন উচ্চাঙ্গের উপদেশ দান করলেন যাতে আমাদের চিত্ত কম্পিত এবং চক্ষু অশ্রু বহমান হল। আমরা বল্লাম, হে আল্লাহর রসুল! এটা যেন বিদায়ী উপদেশ, অতএব আমাদেরকে কিছু অসিয়ত (অতিরিক্ত নির্দেশ দান করুন। তিনি বললেন, "তোমাদেরকে আল্লাহ-ভীতি এবং (পাপ ছাড়া অন্য বিষয়ে) আমীর (বা নেতা) এর আনুগত্য স্বীকার করার অসিয়ত করছি। যদিও বা তোমাদের আমীর এক জন ক্রীতদাস হয়। আর অবশ্যই তোমাদের মধ্যে যারা আমার বিদায়ের পর জীবিত থাকবে তারা অনেক রকমের মতভেদ দেখতে পাবে। অতএব তোমরা আমার এবং আমার সুপথপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ অবলম্বন করো, তা দন্ত দ্বারা দৃঢ়তার সহিত ধারণ করো। (তাতে যা পাও মান্য কর এবং অন্য কোনও মতের দিকে আকৃষ্ট হয়ো না।) এবং (দ্বীনে) নবরচিত কর্মসমূহ হতে সাবধান! কারণ, নিশ্চয়ই প্রত্যেক বিদআহ (নতুন আমল) ভ্রষ্টতা।" (আবু দাউদ ৪৪৪৩, তিরমিযী ২৮১৫, ইবনে নাজাহ ৪২ নং)

উল্লেখিত হাদীস শরীফটি উম্মাহর মাঝে ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করতে, ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী মতভেদ ও অনৈক্য নির্মূল করতে উদ্বুদ্ধ করে। সুন্নাহর অনুসরণ করে, জামাআত (সাহাবা)র অনুগমন করে, দাওয়াত পদ্ধতি, কর্ম, কথা ও বিশ্বাসে প্রত্যেক নব রচিত কর্মসমূহ বা বিদআত হতে সুদুরে থাকতে আদেশ করে; যা বিভ্রাট ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকারী বিতর্ক ও কলহের প্রতি উম্মাহকে টেনে নিয়ে যায়। আল্লাহ তাআলার প্রত্যাদেশ ও শরীয়ত উম্মাহর

কাছে পৌছে না দেওয়া ও যথাযথভাবে তা বিবৃত না করার পূর্বে তাঁর প্রিয় রসুল ﷺ ইহকাল ত্যাগ করেন নি। তিনি উম্মাহকে সে সকল কিছু কর্তব্যাকর্তব্য বর্ণনা করে গেছেন যাতে তাদের পার্থিব ও দ্বীনী কল্যাণ ও ইষ্ট নিহিত ছিল। তিনি উম্মাহকে এমন সমুজ্জ্বল পথে রেখে গেছেন যার রজনীও দিবসের ন্যায় দীপ্তিমান; যে পথ হতে একমাত্র ধ্বংসগামী ব্যতীত অন্য কেউ বক্রতা অবলম্বন করে না।

আর আল্লাহ জাল্লা শানুহ তাঁর প্রিয় নবীর জন্য দ্বীনকে পরিপূর্ণ ও তাঁর সম্পদকে সম্পূর্ণ করেছেন। আর সমগ্র মানব ও দানব জাতির জন্য ইসলামকেই একমাত্র ধর্ম বলে মনোনীত ও নির্বাচিত করেছেন। তিনি বলেন,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

অর্থাৎ, আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ (নেয়ামত) সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের ধর্মরূপে মনোনীত করলাম। (সূরা মায়েদাহ ৩ আয়াত) তিনি অন্যত্র বলেন,

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

অর্থাৎ, কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম চাইলে তা কখনো তার নিকট হতে গ্রহণ করা হবে না এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত হবে। (সূরা আলে ইমরান ৮৫ আয়াত)।

সুতরাং এখান হতে প্রতীয়মান হয় যে, দ্বীন অসম্পূর্ণ নয়, বরং সম্পূর্ণ। আর রসূল ﷺ তা স্পষ্টভাবে প্রচারও করে গেছেন।

অতএব এর পরেও যদি কোন ব্যক্তি দ্বীনে নতুন কিছু আবিষ্কার করে; যার নির্দেশ না কিতাবে আছে সুন্নাহতে এবং না খুলাফায়ে রাশেদীন বা কোনও সাহাবার আদর্শে, তা আকীদা হোক বা আমল, কথা হোক বা ইসলামের প্রতি দাওয়াতী পদ্ধতি তবে ঐ ব্যক্তি যেন বলে যে, দ্বীন অসম্পূর্ণ, পুর্ণাঙ্গ নয়। আর সে এই অসম্পূর্ণতাকে নতুন কিছু (বিদআত) রচনার মাধ্যমে পূর্ণতা দান করার দুঃসাহসিকতা করে থাকে। অথচ মহান আল্লাহ বলেন, “আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম।” অথবা ঐ ব্যক্তি যেন এই বলে বা ধারণা করে যে, দ্বীন তো পূর্ণাঙ্গ।

বিদআতের সংজ্ঞার্থঃ

বিদআতের আভিধানিক অর্থ, বিনা নমুনা বা উদাহরণে কিছু রচনা বা উদ্ভাবন করা বা আবিষ্কার করা। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, “(আল্লাহ) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর আবিষ্কর্তা।” অর্থাৎ বিনা নমুনায় সৃষ্টিকর্তা। (সূরা বাকারাহ ১১৭ আয়াত) বলা হয় বিদআত করেছে; অর্থাৎ, এমন পথ বা প্রথা রচনা করেছে, পুর্বে যার কোন উদাহরণ ছিল না। যেমন, যে ঘটনা বা কান্ড পুর্বে কখনো ঘটেনি তাকে বলা হয় অভূতপূর্ব ঘটনা।

এই সকল অর্থের প্রতি খেয়াল করে বিদআতকে বিদআত বলা হয়েছে সুতরাং এমন ধর্মীয় বিশ্বাস, কথা বা কাজ যার কোন দলীল শরীয়তে নেই। এই বিদআতীর পূর্বে আল্লাহর রসূল অথবা তার কোন সাহাবী বলেননি বা করেননি, যার কোন ইঙ্গিত দ্বীনে বা কুরআনে অথবা সহীহ সুন্নাহতে নেই, নতুনভাবে তাই বিশ্বাস করা, বলা বা করাকে - যা আসল শরীয়তের সমতুল্য মনে করা হয় এবং অতিরঞ্জন করে তা পালনীয় ধর্মীয় রীতি স্বরূপ করার উদ্দেশ্যে হয় - তাকে বিদআত বলে।

অন্য কথায়, প্রত্যেক সেই আমল (ইবাদত মনে করে বা আল্লাহর সন্তুষ্টি আছে মনে বা শরীয়ত ভেবে বা করতে হয় অথবা নেই ভেবে, নেকী বা গোনাহ হয় মনে করে) করা বা ত্যাগ করা, যার নির্দেশ বা ইঙ্গিত দ্বীনে নেই তাকে বিদআত বলে। (হুজাজ প্লাবিয়্যাহ) অতএব যে আমলের মূল দ্বীন বা শরীয়তে আছে এবং কিছুকাল পরে যদি তার নতুনভাবে সংস্কার সাধন করা হয়, তাহলে তাকে আভিধানিক অর্থে বিদআত বলা গেলেও শরয়ী অর্থে তা বিদআত’ নয়। যেমন কিছু সলফের উক্তি “নি’মাতিল বিদআহ” (উত্তম আবিষ্কার বা বিদআহ) শরয়ী অর্থে বিদআত নয়। হযরত উমার (রাঃ) যখন সমস্ত লোকদেরকে রমযানের তারাবীহ পড়ার জন্য একই ইমামের পিছনে জমায়েত হয়ে নামায পড়তে দেখলেন, তখন তিনি বললেন, ‘নি’মাতিল বিদআতু হা-যিহ। (অর্থাৎ, উত্তম আবিষ্কার এটা!) এটা আভিধানিক অর্থে বিদআহ।

কারণ, রমযানে জামাআত করে তারাবীহর নামায পড়ার মূল ভিত্তি। শরীয়তে ছিল। রসুল প্লঃ নিজে সাহাবাবৃন্দকে নিয়ে জামাআত করে দুই-তিন রাত্রি তারাবীহর নামায পড়েছিলেন। তারপর ঐ নামায উম্মতের উপর ফরয হয়ে যাবে এবং তা আদায় করতে তারা অক্ষম হবে -এই আশঙ্কায় আর কোন দিন জামাআত করে পড়েননি। সুতরাং তা শরয়ী অর্থে বিদআত নয়। পক্ষান্তরে হযরত উমরের বা অন্যান্য খলীফা ও সাহাবার কর্মও সুন্নাহ।। সতর্কতার বিষয় এই যে, হযরত উমার (রাঃ) বা খুলাফায়ে রাশেদীন-দের কোন কাজের দোহাই দিয়ে বিদআত করা বা নবী -এর পরে তাঁদের কোন কর্মকে তাঁদের পরবর্তী যুগে কোন নতুন ধর্মীয় কাজ বা প্রথা রচনা করার উপর দলীল মনে করা যাবে না।

তাই এ কথা কারো মনে করা উচিত নয় যে, হযরত উসমান (রাঃ), সমস্ত কুরআনী আয়াতকে জমা করে মুসহাফ বা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেছেন যা এক নতুন কাজ ছিল, তাই আমাদেরও ঐ ধরনের কোন অন্য কাজ করা চলবে, অথবা তাঁদের ঐ ধরনের কর্মগুলি বিদআত ছিল। কারণ, আল্লাহর রসুল (সা.)-এর উক্তিতে প্রমাণিত যে, তাঁদের যে কোনও কাজ সুন্নাহ, বিদআত নয়; যদি তা তাঁর নির্দেশের পরিপন্থী না হয় তবে। অতএব তাঁদের নির্দেশিত বা কৃতকর্মের আমরা অনুসরণ করতে পারি; কিন্তু তাতে কোন অতিরিক্ত অথবা তাঁদের রচনার অনুকরণে কোন অন্য নতুন কর্ম রচনা করতে পারি না। আবার কোন দেশাচার, লৌকিক বা কোন বৈষয়িক কাজ (ধর্ম না ভেবে করাকে) আভিধানিক অর্থে বিদআত বলা গেলেও

শরীয়তের পারিভাষিক অর্থে তা বিদআত' নয় এবং রসুল (সা.)-এর উদ্দেশ্য ঐ ধরনের কর্মের উপর সতর্ক করাও নয়। অবশ্য ঐ সমস্ত প্রথা বা কর্ম শরীয়ত পরিপন্থী হলে সে কথা ভিন্ন।

তদনুরূপ কোন বৈষয়িক বা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারও শরয়ী অর্থে বিদআত নয়। তা সাধারণ কর্মে অথবা দ্বীন ও ইবাদতের অসীলাহ ও মাধ্যমস্বরূপ ব্যবহার করাও বিদআতের পর্যায়ে পড়ে না। যেমন আযান, নামায বা খুতবার জন্যে লাউড-স্পীকার, বিদ্যুৎ বাতি, শিক্ষার অভিনব ব্যবস্থা ইত্যাদিকে বিদআত বলতে পারি না।

পক্ষান্তরে যদি কোন কাজ ইবাদত বা নৈকট্যদানকারী না ভেবে করা হয়, তবে তার তিন অবস্থা হতে পারে;

(১) সে কাজের কোন স্পষ্ট নির্দেশ শরীয়তে থাকলেও তা ব্যাপক অর্থ ও মৌলিক নীতির অন্তর্ভুক্ত হবে। অস্পষ্ট বা পরোক্ষ ইঙ্গিত থাকলে তা বিদআত বলে গণ্য হবে না। বরং তা ঐ মূল অর্থ অনুযায়ী ঐ নির্দেশ ওয়াজেব হলে ঐ কর্ম ওয়াজেব; নচেৎ মুস্তাহাব অথবা হারাম হবে।

(২) সে কাজের প্রতি অস্পষ্টও কোন ইঙ্গিত শরীয়তে পাওয়া যাবে না এবং তা মৌলিক নীতি বা ব্যাপক দলীলের আওতাভুক্ত নয়। বরং সে বিষয়ে শরীয়ত নীরব। তাহলে তা মুবাহ। অর্থাৎ, তাতে পাপ-পুণ্য কিছুই নেই।

(৩) সে কাজ ব্যাপক কোন দলীলের বা মৌলিক নীতির অন্তর্ভুক্ত নয় এবং এ বিষয়ে শরীয়ত নীরব। কিন্তু তা ইবাদত বা আমলের কেবল অসীলাহ ও মাধ্যম মাত্র। তাহলে তা যে কাজের অসীলা তার হিসাবে অসীলারও গুরুত্ব হবে। যেমন তবলীগ বা ইসলাম প্রচারের জন্য রেডিও,

টিভি, টেপরেকর্ডার, আযান, জলসা বা দর্সের জন্য মাইক ইত্যাদি আমলের সহায়ক যন্ত্রাদি ব্যবহার করা বিদআতের পর্যায়ে পড়ে না। (ফারাইদুল ফাওয়াইদ, ইবনে উষাইমীন ১৪৪-১৪৫ পৃঃ)

বিদআতের প্রকারভেদঃ

বৈশিষ্ট্যের দৃষ্টিকোণ থেকে বিদআতকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়;
১.বিদআহ হাক্বীক্বিয়্যাহ (প্রকৃত বিদআত) এবং
২. বিদআহ ইযাফিয়্যাহ (অতিরিক্ত বিদআত)।

১.
প্রকৃত বিদআত তখন বলা হয়, যখন ধর্ম-কল্প কাজের ভিত্তি কিতাব, সুন্নাহ অথবা ইজমাতে পাওয়া যায় না। বরং ভিত্তিহীনভাবেই সে কাজকে দ্বীন বলে মেনে নেওয়া হয়। যেমন, কোন সন্দিহানে পড়ে বিনা কোন শরয়ী ওযর অথবা সৎ উদ্দেশ্যে কোন হালাল বস্তুকে হারাম অথবা হারাম বস্তুকে হালাল করা। যেমন, বৈরাগ্য অবলম্বন করা, মাছ-মাংসাদি উত্তম খাদ্য ভক্ষণ না করা, উত্তম পরিচ্ছদ পরিহার করা, প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও বিবাহ না করা ইত্যাদি। আত্মাকে কষ্ট দিয়ে (যেমন দেহে কাঁটা, জিভে শিক ফুড়ে আল্লাহর নৈকট্য আশা করা, জ্যান্ত কবর নিয়ে। মাটির উপর হাত বের করে তসবীহ পড়া, মর্সিয়া-মাতমে বুক চিরা, পিঠে চাবুক মারা প্রভৃতির মাধ্যমে) ইবাদত করা বা নেকী লাভের আশা করা।

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমরা নবী (সা.)-এর সহিত জিহাদে (সফরে) থাকতাম এবং আমাদের সঙ্গে আমাদের পত্নীরা থাকত না। (দীর্ঘ সফরের ফলে যৌনজ্বালা অনুভূত হলে) আমরা তাঁকে বললাম, আমরা খাসি করব না কি?” তিনি আমাদেরকে তাতে নিষেধ করলেন এবং বস্ত্রের বিনিময়ে (সফরে) কোন নারীকে বিবাহ করতে অনুমতি দিলেন। অতঃপর এই আয়াত পাঠ করলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য যে সব উৎকৃষ্ট বস্তু বৈধ করেছেন, সে সকলকে তোমরা অবৈধ করো না। সীমালংঘনকারীদেরকে আল্লাহ মোটেই ভালবাসেন না। (সুরা মায়েদাহ ৮৭ আয়াত, বুখারী ৮/২৭৬)।

তদনুরূপ এমন মনগড়া ইবাদত রচনা করা যার বিধান আল্লাহ তাআলা দেননি। যেমন বিনা পবিত্রতায় নামায পড়া, কাওয়ালী, গান-বাজনা প্রভৃতির মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি চাওয়া ইত্যাদি। অনুরূপভাবে শরীয়তে সুন্নাহকে দলীল মানতে অস্বীকার করা, শুদ্ধ বর্ণনার উপর জ্ঞান ও বিবেককে প্রাধান্য দেওয়া এবং জ্ঞানের নিক্তিতে শরীয়তকে ওজন করা ইত্যাদি।

তদনুরূপ হকীকত, তরীকত বা মারেফত ইত্যাদি নতুন পথ রচনা করা বা মান্য করা। নির্দিষ্ট ধর্মীয় মর্যাদা (বা কামালে) পৌছে গেলে -আমল ওয়াজেব হওয়ার শর্তাবলী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও - আর কোন আমল ঐ কামেলের উপর ওয়াজেব। নেই ভাবা। অথবা মারেফতীর সেই মঞ্জিলে পৌছে গেলে বান্দার নিকট হারামহালাল সব একাকার হয়ে যায়; তখন আর তাকে শরীয়তের বাধা মেনে চলতে হয় না, ব্যভিচার, শুয়োর, কুকুর, মাদক দ্রব্য ইত্যাদি হারাম বস্তু তার জন্য হালাল হয়ে যায় -এই ধারণা করা অথবা কোন মরমিয়া তত্ত্বানুসন্ধান করা ইত্যাদি।

২.

অতিরিক্ত বিদআত তখন হয়, যখন আসল আমল তো বিধেয় থাকে; কিন্তু ঐ বিধেয় কর্মের সাথে আরো কিছু অতিরিক্ত কর্ম মনগড়াভাবে যুক্ত করে দেওয়া হয়। যার ফলে পুরো কর্মটাই অবিধেয় বিদআত বলে বিবেচিত হয়। লোক মাঝে অধিকাংশ এই বিদআতেরই প্রচলন বেশী। যেমন; নামায, রোযা, যিকর, দুআ, দরূদ, কষ্টের সময় পূর্ণ অযু প্রভৃতি বিধেয় ইবাদত; যে সবের বিধান শরীয়তে রয়েছে। কিন্তু কেউ যদি বলে, আমি এক রাকআতে একশ বার কুল পড়ে অথবা প্রতি রাকআতে তিন বার করে সিজদা করে নামায পড়ব, রৌদ্রে কষ্ট ভোগ করে ছায়া থাকা সত্ত্বেও তা গ্রহণ না করে রোযা করব, বছরের তিন শ’ পঁয়ষট্টি দিনই রোযা রাখব। একত্রিত হয়ে সমস্বরে জামাআতী যিকর করব, যেখানে বিধেয় নয়। সেখানে একত্রে হাত তুলে জামাআতী দুআ করব, জামাআতবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে সমস্বরে দরূদ পড়ব ইত্যাদি তবে সে বিদআতী। অযুর সময় অতিরিক্ত বিদআত যেমন, কোন ব্যক্তির নিকট গরম পানি মজুদ আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও কঠিন শীতের সময় অতি শীতল পানি দ্বারা অযু করা উত্তম মনে করে এবং ঐ পানি দ্বারা অযু করে আত্মাকে কষ্ট দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির আশা করে।

সুতরাং নামায, রোযা, যিকর প্রভৃতি শরীয়ত-সম্মত (ফরয) ইবাদত যা পালন করতে বান্দা আদিষ্ট হয়েছে, যা আদায় করতে তাকে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে এবং তার বিনিময়ে মহাপুণ্যলাভের প্রতিশ্রুতিও দান করা হয়েছে। কিন্তু তার সহিত পালনের অতিরিক্ত মনগড়া পদ্ধতি ও প্রণালী সম্পর্কে কোন নির্দেশ তাকে দেওয়া হয়নি। তাই যেমনভাবে তাকে তা পালন করতে বলা হয়েছিল, ঠিক তেমনিভাবে তা তার করা উচিত ছিল। তা না করে স্বকপোলকল্পিত

পদ্ধতিতে শরীয়তের উপর সংশোধন ও সংযোজন সাধন করার অপচেষ্টা ও দুঃসাহসিকতা করে। অথচ আল্লাহ বলেন, "আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম।"

নবী-দিবসের বিদআত; অবশ্যই নবী (সা.)-এর প্রতি ভক্তি, প্রেম ও ভালবাসা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ওয়াজেব। "কোন মানুষই ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার আপন প্রাণ, সন্তান, পিতা এবং সকল মানুষ (বরং সকল সৃষ্টি) অপেক্ষা তাঁকে অধিক ভালবেসেছে।" (বুখারী)। কিন্তু সংসারে প্রত্যেক ভালোবাসা বা প্রেমের এক এক রকম ভিন্ন-ভিন্ন ভাব ও ধরন আছে। বিশ্বপ্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সা.)-কে ভালবাসার ধরন হল, তাঁর আনুগত্য করা, তাঁর কথার অনুসরণ করা, তাঁর আদর্শে আদর্শবান হওয়া, তাঁর প্রত্যেক নির্দেশ পালন করা, প্রত্যেক নিষিদ্ধ কর্ম হতে বিরত থাকা, তিনি বিদআত (বা দ্বীনে অভিনব পথ রচনা) করতে নিষেধ করেছেন তা মান্য করা।

যদি এসব কেউ করতে পারে তবে সত্যই সে নবীর যথার্থ প্রেমিক বা ভক্ত। নচেৎ যে কেবল মুখে প্রেমের দাবী করে, লোক সমাজে প্রচার করে এবং প্রিয়তমের মন ও আদেশের প্রতিকূলে চলে সে এক কপট ভন্ড প্রেমিক ব্যতীত কিছু নয়। হ্যাঁ, নবী দিবস এক অভিনব রচিত নবীপ্রেম-বিকাশ পদ্ধতি। যার কোন নির্দেশ অথবা ইঙ্গিত তিনি দেননি। তাঁর একান্ত ভক্ত সাহাবাবৃন্দও ঐ দিবস পালন করে তাঁর প্রগাঢ় ভক্তি ও প্রেমের প্রমাণ ও পরিচয় দিয়ে যাননি। অথচ তাঁরা এই ধর্মধ্বজীদের চেয়ে কত শতগুণ অধিক তাঁর কথার অনুসরণ করতেন, তাঁকে তা'যীম ও ভক্তি করতেন। তাঁদের পরে কোন আহলে সুন্নাহর ইমামও এ পদ্ধতি প্রসঙ্গে কোন ঈঙ্গিত দেননি। এই প্রেম প্রণালী বা ভক্তি প্রকাশের ফ্যাশন' রাফেযাহ, ফাতেমী বা উবাইদী ফিকাহর লোকেরা আবিষ্কার করে মুসলিম সমাজে প্রচলিত করেছে। যে ফাতেমীদের প্রকৃত বংশধারা সুলামিয়ার একজন ইয়াহুদী হতে শুরু হয়।

এই নবী দিবস প্রসঙ্গে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রঃ) বলেন, খ্রীষ্টানদের অনুকরণে অথবা নবী প্লঃ-এর মহব্বতে (অতিরঞ্জন করে) কিছু লোক তাঁর জন্ম দিনটিকে নবী দিবস'রূপে ঈদের মত পালন করে থাকে। অথচ তাঁর জন্মদিন। প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতান্তর রয়েছে। (অনেকে বলেছেন ১২ রবিউল আওয়াল। কিন্তু সর্বসম্মত অভিমতে তাঁর মৃত্যু দিন ঐ তারীখেই। তাই ঐ দিনে জন্মের খুশী মানালে তাঁর মৃত্যুর দিনে খুশী করা হয়। আবার মৃত্যুর শোক পালন করলে জন্মের শুভ আনন্দের পরিপন্থী হয়।) পরন্তু ঐ দিনটিকে অথবা নবীদিবস নামক কোন ঈদ সফলদের কেউই পালন করে যাননি। (তারা তো কেবল দুটি ঈদই জানতেন।)

অথচ যদি ঐ ঈদ পালনে কোন মঙ্গল থাকত, তাহলে আমাদের চেয়ে তাঁরাই তার অধিক হকদার হতেন। (আমাদের পূর্বে তাঁরাই বেশীরূপে তা পালন। করে যেতেন। কারণ আমাদের

চেয়ে তাঁদের হৃদয়ে নবী (সা.)-এর মহব্বত ও তা'যীম বহুগুণ অধিক ছিল এবং আমাদের অপেক্ষা তাঁরাই অধিক কল্যাণকর ও পুণ্যময় কর্মের খোঁজ ও আশা রাখতেন। পক্ষান্তরে প্রকৃত মহব্বত ও প্রেমের পরিচয় তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণে, তাঁর আদেশ পালনে, তাঁর সুন্নাহ ও আদর্শ দ্বারা জীবন ও চরিত্র গঠনে, তাঁর আনীত শরীয়ত প্রচারে এবং এর উপরে নিজ হস্ত, রসনা ও অন্তর দ্বারা জিহাদে প্রকাশ পায়। মহব্বত প্রকাশের এই পদ্ধতিই প্রাথমিক অগ্রানুসারী মুহাজেরীন ও আনসারদের। এবং যাঁরা শুদ্ধচিত্তে তাঁদের অনুগমন করেছেন তাঁদের।" (ইতিফউস সিরাহিল মুস্তাকীম)

বিদআতের আরো প্রকারঃ

বিদআতকে ভিন্ন আরো তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়ঃ (১) ই'তিক্বাদিয়্যাহ (বিশ্বাসগত) (২) ক্বাওলিয়্যাহ (কথাগত) এবং (৩) আমালিয়্যাহ (কর্মগত)।

১। বিশ্বাসগত বিদআত তখন হয়, যখন কোন কিছুর উপর কারো বিশ্বাস রসূল ও সাহাবার বিশ্বাসের পরিপন্থী হয়। যেমন খাওয়ারেজদের বিশ্বাস; তারা মনে করে যে, কোন মুসলিম কাবীরাহ গুনাহ (চুরি, চুগলী, হত্যা ইত্যাদি) করলে কাফের হয়ে

চিরস্থায়ী জাহান্নামবাসী হবে। তাই তারা অনেক সাহাবাদেরকেও কাফের মনে করে থাকে। অথচ আহলে সুন্নাহর মতে সে ব্যক্তি কাফের হয় না। পাপের পরিমাণ মত দোযখে শাস্তি ভোগ করে ঈমানের কারণে একদিন জান্নাতবাসী হবে। অথবা আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাকে মাফ করে জান্নাতে দেবেন। যেমন অনেকের বিশ্বাস; আল্লাহ সব জায়গায় বিদ্যমান। অথচ আল্লাহ আছেন সপ্তাকাশের উপর আরশে। তাঁর ইলম আছে সর্বত্রে।

তদনুরূপ এই বিশ্বাস যে, মানুষের কর্ম মানুষেরই সৃষ্টি, আল্লাহর সৃষ্টি নয়, অথবা কর্মে মানুষের কোন এখতিয়ার নেই প্রভৃতি।

২। কথাগত বিদআত তখন হয়, যখন এমন কথা বলা ও প্রচার করা হয় যা কিতাব ও সুন্নাহর বিপরীত। যেমন বিভিন্ন ফির্কা; রাফেযাহ, খাওয়ারেজ, জাহমিয়াহ, মু'তাযেলাহ, আশআরিয়্যাহ প্রভৃতিদের কথা। যারা কিতাব ও সুন্নাহর মৌলনীতি বর্জন করে সাহাবায়ে কেরামগণের সমঝ ও তরীকা প্রত্যাখ্যান করে উভয়ের অপব্যাখ্যা ও ভুল অর্থ মনগড়াভাবে করে থাকে এবং আহলে সুন্নাহ তথা দুনিয়ায় কিয়ামত পর্যন্ত হক ও ন্যায়ের সপক্ষে জিহাদে তায়েফাহ মানসুরাহ (সাহায্য প্রাপ্ত গোষ্ঠী) এবং আখেরাতে 'ফিকাহ নাজিয়াহ' (মুক্তিপ্রাপ্ত সম্প্রদায়)-এর বিরোধিতা করে

থাকে। যারা সাহাবাদেরকে গালি দেয়, কেউ কাবীরাহ গোনাহ করলে তাকে কাফের ও চির-জাহান্নামী বলে, আল্লাহ মহিমান্বিত গুণাবলীর তাবীল ও অপব্যাখ্যা অথবা অস্বীকার করে ইত্যাদি।

৩। কর্মগত বিদআত তখন হয়, যখন এমন কোন কাজ দ্বীন ভেবে বা করতে হয় ভেবে করা হয়, যা শরীয়তে বর্ণিত কাজ ও তার পদ্ধতির প্রতিকুল হয়। যেমন। শবেবরাত, শবে মিরাজ, মুহারাম, চালশে প্রভৃতি পালন করা।

বিদআতের প্রতিক্রিয়ার দিকে লক্ষ্য করে তাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়

(ক) বিদআত মুকাফফিরাহ

(খ) গায়র মুকাফফিরাহ।

(ক) মুকাফফিরাহ বিদআত তখন বলা হয়, যখন ঐ বিদআত করার ফলে বিদআতী কাফের বলে গণ্য হয়। যেমন, সর্ববাদিসম্মত কোন দ্বীনী অনুশাসনকে অস্বীকার করা, কোন ফরয কর্মকে অস্বীকার করা, অথবা যা ফরয নয় তাকে ফরয। করে নেওয়া, সর্ব্বসম্মত কোন হালাল বস্তুকে হারাম অথবা তার বিপরীত করা। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল অথবা কিতাব প্রসঙ্গে এমন বিশ্বাস রাখা, যা হতে আল্লাহ, তাঁর রসুল এবং কিতাব পবিত্র।

যেমন; আল্লাহর পুত্র আছে ভাবা, রসুলকে আল্লাহ মনে করা (আহমাদকে আহাদ মনে করা) কুরআনকে মখলুক (সৃষ্ট) মনে করা ইত্যাদি। তদনুরূপ কবর বা আস্তানা পূজা করা এবং জান্নাত, জাহান্নাম, তকদীর, ফিরিশ্মা জিন প্রভৃতি অস্বীকার ও অবিশ্বাস করা ইত্যাদি।

(খ) গায়র মুকাফফিরাহ বিদআত তখন বলা হয়, যখন বিদআত করে বিদআতী। তার কারণে কাফের হয়ে যায় না, তবে পাপী নিশ্চয় হয়। যেমন, নির্দিষ্ট সময় হতে নামায দেরী করে পড়া, ঈদের নামাযের পুর্বে খুতবাহ পড়া, বিভিন্ন পর্ব ও ঈদের উদ্ভাবন করা ইত্যাদি।

প্রকাশ যে, বিদআতে হাসানাহ (যে বিদআত কোন উপকার ও মঙ্গলের খাতিরে রচনা করা হয়) বলে কোন বিদআত নেই; যা করলে পাপ না হয়ে পুণ্যলাভ হয়, অথবা তা মুবাহ। বরং দ্বীনে প্রত্যেক নবীন বিরচনই বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআতই সাইয়েআহ ও ভ্রষ্টতা। বলা বাহুল্য, বিদআতকে বিদআতে হাসানাহ ও বিদআতে সাইয়েআহ এই দুই ভাগে ভাগ করাও এক বিদআত। রসুল (সা.) জুমআর খুতবায় বলতেন, “নিশ্চয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ কথা আল্লাহর বাণী

এবং সর্বোত্তম হেদায়াত (পথনির্দেশ) মুহাম্মাদ (সা.)-এর হেদায়াত। সর্বনিকৃষ্ট বিষয় যাবতীয় অভিনব রচিত বিষয়। প্রত্যেক অভিনব রচিত বিষয়ই বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা।" অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, "আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতাই জাহান্নামে।"

সতর্কতার বিষয় যে, হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তি ইসলামে কোন উত্তম সুন্নাহ (প্রথা বা রীতি রচনা বা) চালু করে, তার জন্য রয়েছে ঐ সুন্নাহর সওয়াব এবং তার সওয়াবও যে ঐ সুন্নাহর উপর আমল করে------।"

এর অর্থ এ নয় যে, যদি কেউ শরীয়তে কোন উত্তম কর্ম বা প্রথা নতুনভাবে প্রচলন। করে তবে সে ঐ সওয়াবের অধিকারী হবে। বরং এর অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি কোন বিধিসম্মত উত্তম কাজ প্রারম্ভ করে এবং তার দেখাদেখি অন্যান্য লোক সেই কাজ করে, অথবা কোন সুন্নাহর সংস্কার করে; অর্থাৎ, যা আসলে সুন্নাহ ও দ্বীনী রীতি, কিন্তু তার উপর কেউ আমল না করার ফলে তা মৃতপ্রায় থাকে এবং কেউ এসে তা পুনর্জীবিত করে, অথবা এমন পদ্ধতি ও পথ আবিষ্কার করে যা আসলে ধর্ম বা সুন্নাহ

হলেও তা ধর্মের অসীলা বা মাধ্যম; যেমন, মাদ্রাসা নির্মাণ, বই-পুস্তক ছাপা ইত্যাদি, তাহলে তার জন্য ঐ সওয়াবও রয়েছে।

সুতরাং এ ধরনের কর্ম বা সুন্নাহ মানুষ নিজের তরফ থেকে বিরচন করে না; বরং তার সংস্কার বা বৈধ উন্নয়ন সাধন করে যা উত্তম কাজ। আর তা বিদআত নয়।

বিদআত সৃষ্টির কারণঃ

(১) অজ্ঞতা: দ্বীন বিষয়ে যথার্থ পড়াশুনা না করা বা না জানা, ধর্মের আদেশ ও নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে জ্ঞান না থাকা, সঠিক আরবী ভাষাজ্ঞান না থাকা প্রভৃতি। এসব বিষয়ে সঠিক জ্ঞান না থাকলে অবশ্যই মানুষ বিদআত ও ভ্রষ্টতায় পড়তে বাধ্য। যেমন পথ না চিনলে অবশ্যই মানুষ ভ্রান্ত পথে বিপথগামী হতে বাধ্য হয়।

শরীয়ত মুসলিমকে জ্ঞান শিক্ষার উপর ফরযরূপে উদ্বুদ্ধ করে। অজান্তে কোন কথা আন্দাজে বলতে সাবধান করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

অর্থাৎ, বল, আমার প্রতিপালক নিষিদ্ধ (হারাম) করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা আর পাপাচারকে ও অসঙ্গত বিরোধিতাকে এবং কোন কিছুকে আল্লাহর শরীক করাকে - যার কোন দলীল তিনি অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহর উপর এমন। কিছু বলাকে যে সম্বন্ধে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই। (সূরা আরাফ ৩৩ আয়াত)

(২) প্রবৃত্তি ও খেয়াল-খুশীর অনুসরণ: বিদআত জন্মের এক কারণ প্রবৃত্তি পূজা। কোনও কর্মকে উত্তম মনে করা হয়, অতঃপর শয়তান সেই কর্মকে অধিক সুন্দর ও সুশোভিতরূপে তার মনে প্রবেশ করিয়ে দেয়। মন তা পছন্দ ও বরণ করে। কখনো বা অভ্যাসগতভাবে ঐ কর্মকেই ধর্ম বলে পালন করে। যখন কারো সতর্কবাণীও গ্রাহ্য হয় না। | বিদআত ঐ প্রবৃত্তিরই বোনা জাল। যে প্রবৃত্তির কাছে কিতাব ও সুন্নাহর ততটা বা কিছুটাও মান নেই। বস্তুতঃ যারাই কিতাব ও সুন্নাহর পথ ছেড়ে অন্য পথে চলতে চায় তারাই প্রবৃত্তির পূজা করে এবং নিজ মনের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ ۚ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

অর্থাৎ, অতঃপর ও যদি তোমার আহবানে সাড়া না দেয় তাহলে জানবে যে, ওরা তো কেবল নিজেদের খেয়াল-খুশীরই অনুসরণ করে। আর আল্লাহর পথনির্দেশ বিনা যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে তার চেয়ে অধিক বিভ্রান্ত আর কে? (সূরা কাসাস ৫০ আয়াত)

(৩) সন্দিহান উক্তির উপর নির্ভরতা: বিদআত সৃষ্টির এক কারণ সন্দিহান ও রূপক (দুর্বোধ্য) আয়াত বা হাদীসের মনগড়া অর্থ ও ব্যাখ্যা করা। যাতে ব্যাখ্যাতা অসঙ্গত তাৎপর্য করে আসল উক্তির পরিবর্তন ঘটায় এবং এক উক্তির সহিত অন্য অক্তি পরস্পর-বিরোধিতা ব্যক্ত করে। কিতাবের কিছু অংশের উপর ঈমান আনে এবং কিছু অংশকে অস্বীকার। করে। ঐ সমস্ত রূপক আয়াতের মনগড়া ইলম মনে সঞ্চার করে বাতেনী ইলমের খাজানা পেয়েছে বলে দাবী করে। অথচ এরাই হচ্ছে বক্রতা ও ভ্রষ্টতার ভান্ডার। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রসূল (সা.) এই আয়াত তেলাঅত করলেন:

هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۖ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

অর্থাৎ, তিনিই তোমার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যার আয়াত সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন; এগুলি কিতাবের মূল অংশ। আর অন্যগুলি রূপক। যাদের মনে বক্রতা আছে তারা ফিৎনা (বিশৃঙ্খলা) সৃষ্টি ও ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যা রূপক তার অনুসরণ করে। বস্তুতঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা সুবিজ্ঞ তারা বলে, আমরা এ বিশ্বাস করি, সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে আগত। বস্তুতঃ বুদ্ধিমান লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করে। (সূরা আলে ইরান ৭ আয়াত)

অতঃপর তিনি (রসুল) বলেন, "সুতরাং যাদেরকে রূপক আয়াতের অনুসরণ করতে দেখবে আল্লাহ তাদেরকেই উদ্দেশ্য করেছেন, তাই তাদের থেকে সাবধান থেকো। (বুখারী ও মুসলিম) | রূপক আয়াত নিয়ে বিদ্যা জাহিরকারী (ভেদ প্রকাশকারী) ও বিভিন্ন সংশয় সৃষ্টিকারী এক ব্যক্তিকে উমার (রাঃ) প্রচন্ডভাবে প্রহার করে এমন শায়েস্তা করেছিলেন যে, অতঃপর আর কোন দিন তার মনে কোন সন্দেহের উদ্রেক হয়নি। এমন লোক যে এ যুগে কম, তা নয়। কিন্তু সে উমার আর নেই। তাই তো এমন কেরামতবাজদের বিদআতে ভ্রষ্টতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়ে মুসলিম সমাজ অধঃপতনের শিকার হয়েছে।

(৪) কেবলমাত্র জ্ঞানের উপর ভরসা করা: আল্লাহ তাআলা মানুষকে শ্রেষ্ঠতম অবয়বে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর সৃষ্টজগতে অনেকের চেয়ে মানুষকেই অধিকতম শ্রেষ্টত্ব ও সম্মান প্রদান করেছেন। মানুষের দেহ সৃষ্টি-বিচিত্রে তাঁর বিস্ময়কর শক্তি এবং সীমাহীন প্রজ্ঞার অভিব্যক্তি ঘটেছে। মানুষের দেহ-বিচিত্রে মস্তিষ্ক ও বুদ্ধি আল্লাহর এক মহাদান। যার দ্বারা মানুষ ভালোকে মন্দ হতে এবং হককে বাতিল হতে পার্থক্য করতে পারে। শরীয়তের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ জ্ঞানকে

কাজে লাগাতে বলা হয়েছে। এই জ্ঞান ও বিবেক যাতে বিনষ্ট হয়ে যায়, তার বিভিন্ন ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কিন্তু মানুষ এই অমূল্য জ্ঞান-সম্পদকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন ও অবহেলার শিকার হয়েছে। কিছু মানুষ আছে যারা কোন বিষয়ে জ্ঞান খাটাতেই চায় না; বরং অন্ধভাবেই সবকিছু বিশ্বাস করে ও মেনে নেয়। এমন কি যেখানে শরীয়ত আদেশ করেছে, সেখানেও জ্ঞানকে ব্যবহার করতে কার্পণ্য বা আলস্য করে। আল্লাহ পাক বলেন,

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

অর্থাৎ, আমি ওদের জন্য আমার নিদর্শনাবলী বিশ্বজগতে ব্যক্ত করব এবং ওদের নিজেদের (দেহ) মধ্যেও; ফলে ওদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, তা সত্য। একি যথেষ্ট নয় যে, তোমার প্রতিপালক সর্ববিষয়ে সাক্ষী? (সুরা ফুসসিলাত ৫৩ আয়াত)

(৫) ইমাম ও বুযুর্গদের অন্ধানুকরণ ও পক্ষপাতিত্ব: বিদআত প্রসারের এটি অন্যতম প্রধান কারণ। আকীদা ও আহকামে আল্লাহ ও রসুলের উক্তি এবং মীমাংসার উপর বিদআতীরা নিজেদের বুযুর্গদের কথা ও ফায়সালাকে অগ্রাধিকার দেয়। অন্ধভাবে তাই বিশ্বাস করে যা তাদের মাননীয় বুযুর্গ বলে। অতিরঞ্জনে অনেকে তাদের বুযুর্গকে ত্রুটিহীন নিস্পাপ মনে করে। মনের আসনে মান্যবর বুযুর্গ বা আলেমকে এমন স্থান দেয় যে, সে যা বলে বা যা করে, তাই। তাদের ধর্ম, কর্তব্য ও বিশ্বাস্য হয়। আর এর বিপরীত সবকিছু অধর্ম ও অমান্য হয়; যদিও বা এই বিপরীত কর্ম ও বিশ্বাস কুরআন ও সহীহ সুন্নায় বর্তমান থাকে। ব্যক্তি পূজার এই অতিরিক্ততায় অনেকে মনে করে যে, তাদের বুযুর্গ যা জানে তা আর অন্য কেউ জানে না বা জানতে পারে না।

(৬) বিদআতীর সংসর্গ: বিদআতীর সংসর্গ ও সাহচর্য বিদআত প্রসারে সহায়ক হয়; বিশেষ করে যদি সহচরের কোন পার্থক্য জ্ঞান না থাকে। আবার সময়-কাল দীর্ঘতার সাথে সাথে বিদআতকে লঘু জ্ঞান (বরং সুন্নাহ মনে করা হয়। ফলে সাথীর মত সাথীও ঐ বিদআতে আমল শুরু করে বসে। এই সংসর্গ প্রসংঙ্গে বহু সকর্তবাণী পুর্বেই আলোচিত হয়েছে।

(৭) উলামাদের নীরবতা ও স্বার্থান্বেষিতা: আল্লাহ পাক বলেন,

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

অর্থাঃ, তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা (লোককে) কল্যাণের দিকে আহবান করবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দেবে ও অসৎকার্য থেকে নিষেধ করবে এবং ওাই হবে সফলকাম। (সূরা আলে ইমরান ১০৪ আয়াত)

কিন্তু এই উম্মাহ যে সমস্ত বিপদ ও দুর্বলতার সম্মুখীন, তার মধ্যে উলামাদের আলস্য ও নীরবতা অন্যতম। আল্লাহর অর্পিত এই মহান দায়িত্ব পালনে উলামাগণ তোষামদ ও মনোরঞ্জনের পথ অবলম্বন করেছেন। উদরপূর্তি, অর্থ লাভ, কিছু আনন্দোপভোগ, পদ ও গদি বহাল প্রভৃতি স্বার্থলাভের খাতিরে বিদআত থেকে নিষেধ করা তো দুরের কথা বরং তাতে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন। বরং তার চেয়েও বিস্মৃকর কথা এই যে, স্বার্থবশে তাতে শরীক হয়ে তার সুষ্ঠু উদ্যাপন করে থাকেন। যাদের অনেকে বেনামাযীর জানাযা পড়েন। কিন্তু তার চালশে (মীলাদ) পড়তে বা তার নামে কুরআনখানী বা শবীনা পড়তে কখনো ভুল করেন না।

অবশ্য এ কথার অর্থ এই নয় যে, কর্তব্যপরায়ণ আলেমই সমাজে নেই। এমন। আলেম তো প্রতি দেশ ও যুগে থেকেছেন ও আছেন, যাঁরা সুন্নাহ থেকে বিদআতের পার্থক্য-নির্বাচন করেন এবং ভালো-মন্দ বিচার করে ভালোর পথে চলতে সমাজকে আদেশ করেন। বিদআতকে দস্তুরমত খন্ডন করেন। কিন্তু তাদের সংখ্যা নিতান্তই কম। আর লোকেরাও তাদেরকে চিনতে ভুল করে।

(৮) বিজাতির অন্ধ অনুকরণ: বিজাতির অনুকরণ করেও মুসলিম নিজের পরিবেশে বিদআত সৃষ্টি করে থাকে। অমুসলিমের কর্মকে পছন্দ করে তা নিজের করণীয় ধর্ম ভেবে বসে। যেমন সাহাবী আবু ওয়াকেদ আল-লাইষী বলেন, রসূল (সা.) এর সহিত আমরা হুনাইনের পথে বের হলাম। তখন আমরা সদ্য নও মুসলিম ছিলাম। মুশরিকদের একটি কুল গাছ ছিল; যার নিকটে ওরা ধ্যানমগ্ন হত এবং (বর্কতের আশায়) তাদের অস্ত্র-শস্ত্রকে তাতে ঝুলিয়ে রাখত; যাকে যা-তে আনওয়াত্ব’ বলা হত। সুতরাং একদা আমরা এক কুল গাছের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম। (তা দেখে) আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের জন্য একটি ‘যা-তে আনওয়াত্ব’ করে দিন যেমন ওদের রয়েছ। (তা শুনে) তিনি বললেন, 'আল্লাহু আকবার! এটাই তো পথরাজি! যার হাতে আমার জীবন আছে তাঁর কসম! তোমরা সেই কথাই বললে যে কথা বানী ইস্রাঈল মুসাকে বলেছিল, আমাদের জন্য এক দেবতা গড়ে দিন যেমন ওদের অনেক দেবতা রয়েছে!’ মুসা বলেছিলেন, 'তোমরা মূর্খ জাতি। অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী (জাতির) পথ অনুসরণ করবে।” (তিরমিযী ২ ১৮০, মুসনাদ আহমাদ ৫/২ ১৮ নং)

অতএব উক্ত হাদীসে স্পষ্ট হয় যে, কাফেরদের অনুকরণই বানী ইসরাঈল এবং কিছু নও মুসলিম সহাবীকে এমন নিকৃষ্ট আবেদনে উদ্বুদ্ধ করেছিল। আর সে আবেদন ছিল এমন মাবুদ গড়া বা নির্দিষ্ট করা যেমন কাফেরদের ছিল; যার নিকট তারা ধ্যানমগ্ন হত, বর্কতের আশায় তার উপর অস্ত্র ঝুলিয়ে রাখত এবং আল্লাহকে ছেড়ে তার আরাধনা করত।

বস্তুতঃ এই পরিস্থিতিই বর্তমান কালেও বিরাজমান। যেহেতু অধিকাংশ মুসলিম দলই কাফেরদের অনুকরণ করে বিদআত, শির্ক, কুসংস্কার যেমন; দুর্গাপূজা, কবরের উপর পুষ্পার্ঘ-দান, জন্মদিন, বার্থ ডে, নবী দিবস পালন, নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট খাদ্য ভক্ষণ, ইসলামী কোন ঐতিহাসিক দিনকে কেন্দ্র করে উৎসব পালন, স্মারক দিবস উদযাপন, স্মারক মূর্তি প্রতিষ্ঠাকরণ, শোক দিবস পালন, জানাযার বিভিন্ন বিদআত রচনা, সমাধির উপর মাযার নির্মাণ প্রভৃতি কর্ম ধর্ম ও নাজাতের অসীলা ভেবে আবিষ্কার করেছে; যার কোন দলীল আল্লাহ অবতীর্ণ করেন নি।

আল্লাহর রসুল (সা.) সত্যই বলেছেন, “অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির পথ অনুসরণ করবে বিঘত বিঘত এবং হাত হাত পরিমাণ (সম্পূর্ণরূপে)। এমনকি তারা যদি সান্ডার (গোসাপ জাতীয় একপ্রকার হালাল জন্তুর) গর্তে প্রবেশ করে তবে তোমরাও তাদের অনুসরণ করবে (এবং তাদের কেউ যদি রাস্তার উপর (প্রকাশ্যে) স্ত্রী-সংগম করে তবে তোমরাও তা করবে)!” সাহাবাগণ বললেন, আল্লাহর রসূল ইয়াহুদ ও খ্রীষ্টানরা?” তিনি বললেন “তবে আবার কারা?” (বুখারী, মুসলিম ও হাকেম)

বিদআতের নীতিমালাঃ

যে সমস্ত উপায়ে বিদআত চিহ্নিত হয়ে থাকে এবং যে সকল কর্মকে শরীয়তে বিদআত বলে গণ্য করা হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

(১) প্রতি সেই কথা, কাজ ও বিশ্বাস; যদিও বা তা ইজতেহাদী হয়; যা সুন্নাহর প্রতিকূল হয়, তা বিদআত।

(২) প্রতি সেই কর্ম যার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্য লাভের আশা করা যায় অথচ শরীয়ত তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। তা করলে বিদআত করা হয়।

(৩) প্রতি সেই বিষয় যা কোন বর্ণনা বা নির্দেশ ব্যতীত বিধেয় হওয়া সভব নয়। অথচ সে বিষয়ে শরীয়তের কোন বর্ণনা বা নির্দেশ নেই, তা বিদআত। অবশ্য কোন সাহাবী কর্তৃক কোন ইঙ্গিত বা নির্দেশ থাকলে, তা বিদআত বলা যাবে না।

(৪) কাফেরদের সেই আচার-অনুষ্ঠান বা প্রথা; যা ইসলামে ধর্ম বা ইবাদতরূপে (বা করতে হয় ভেবে) পালন করা হয়, তা বিদআত।

(৫) যে বিষয়ের মুস্তাহাব হওয়ার উপর কোন ফকীহ বা আলেম -বিশেষ করে পরবর্তীকালের উলামাগণ বিবৃতি পেশ করেছেন অথচ তার সপক্ষে কোন শরয়ী দলীল নেই, সে বিষয়ও বিদআত।

(৬) প্রতি সেই ইবাদত বা আমল যার পদ্ধতি ও প্রণালী যয়ীফ অথবা মওযু’ (গড়া বা জাল) হাদীস ব্যতীত অন্য কোন সহীহ বা হাসান হাদীসে বর্ণিত হয়নি, তা করা বিদআত।

(৭) ইবাদতে প্রত্যেক অতিরিক্ত, অতিরঞ্জিত ও বাড়তি কাজই (অর্থাৎ ইবাদতে শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত সীমালংঘন করাই) বিদআত।

(৮) প্রত্যেক সেই ইবাদত যা শরীয়ত সাধারণভাবে পালন করতে উদ্বুদ্ধ করেছে, কিন্তু মানুষ তাকে কোন স্থান, কাল, গুণ, নিয়ম-পদ্ধতি, সংখ্যা বা কারণ প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা নির্দিষ্ট করে নিয়েছে তা বিদআত। (আহকামুল জানায়েয, আলবানী)

(৯) প্রত্যেক সেই আচার, কুপ্রথা বা কুসংস্কার; যা শরীয়তসম্মত নয় এবং বিবেক ও জ্ঞান-সম্মতও নয়, যা কিছু জাহেল দ্বীন ও করণীয় কর্তব্য মনে করে তা বিদআত। (মানাসেকুল হজ্জ, আলবানী ৪৫ পৃঃ)

বিদআতের পরিণামঃ

বিদআত ও বিদআতীর পরিণাম -

(১) বিদআত কুফরের ডাকঘর। বিদআতীদের বহু ফির্কা তাদের বিদআতের মাধ্যমে কুফরে পৌছে কাফের হয়ে গেছে; যদিও বা তারা নিজেদের পরিচয় মুসলিম বলেই দিয়ে থাকে। যেমন ‘কামেল পীর বা দরবেশদের উপর থেকে শরয়ী বন্ধন তুলে নেওয়া, তাদেরকে আল্লাহর কিছু বৈশিষ্ট্যে (যেমন, গায়েব জানা, মসীবত দুর করা, সন্তান দান করা প্রভৃতির ব্যাপারে) শরীক করা, তাদের কবর সিজদা করা, বা তওয়াফ করা। কাবীরাহ গোনাহকারী মুসলিমকে কাফের জ্ঞান করা ইত্যাদি। যারা কিছু আমল ও ইবাদত তো করে কিন্তু ঐরূপ বিদআতের পাশে কোনই মূল্য নেই। আল্লাহ পাক বলেন,

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا

অর্থাৎ, যারা কুফরী করে (সত্য প্রত্যাখ্যান করে) তাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকার ন্যায়, পিপাসার্থ যাকে পানি মনে করে; কিন্তু সে ওর নিকট উপস্থিত হলে দেখে তা কিছুই নয়। (সূরা নুর ৩৯ আয়াত)

(২) বিদআতীরা আল্লাহর উপর বিনা ইলমে অনুমান-প্রসূত কথা বলে। সাধারণতঃ বাতেনী দাবীদাররা এই রোগের রোগী। যারা কলবে জ্ঞানার্জন করে থাকে, কুরআন হাদীস ও তফসীরের ইলমে কোন প্রকারের অনুরাগ প্রকাশ করে না, সলফের পথ জানার কোন ইচ্ছা রাখে না। বরং মনগড়া বাতেনী ইলম দ্বারা স্বপ্ন ও পরিকল্পিত কাশফ দ্বারা এবং ত্রিশ এর অধিক পারা কুরআন (?) দ্বারা ভক্তদের মনোরঞ্জন করে থাকে। শরীয়তের উর্ধ্বে থেকে মারেফতীর দাবী করে সবকাজে ফুর্তি মারে। আর এ সবের মাধ্যমে প্রকৃত ইলম ছাড়াই আল্লাহ ও তদীয় রসূলের উপর হলাহল মিথ্যা বলে। যা বান্দার জন্য কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। (সূরা আ'রাফ ৩৩ আয়াত)। মহান আল্লাহ নিজ নবীর জন্য বলেন,

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ)44 (لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ)45 (ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ)46 (فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ)47 (وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ)48 (وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ)49(

অর্থাৎ, সে যদি কিছু রচনা করে আমার নামে চালাতে চেষ্টা করত, তবে আমি তাকে কঠোর হস্তে দমন করতাম এবং তার কণ্ঠশিরা কেটে দিতাম, তখন। তোমাদের কেউই তাকে রক্ষা করতে পারত না। (সূরা হাক্কাহ ৪৪-৪৯ আয়াত)।

(৩) বিদআতীরা সুন্নাহ ও আহলে সুন্নাহর প্রতি নিতান্ত বিদ্বেষ ও ঘৃণা পোষণ করে। উল্টোভাবে নিজেদেরকে আহলে সুন্নাহ' এবং প্রকৃত আহলে সুন্নাহকে 'কাফের', 'ওয়াহাবী ইত্যাদি বলে। অন্ধকার বলে, আলো তুমি নহ ভালো!" বিদআতীরা আহলে সুন্নাহকে বিভিন্নভাবে অপবাদ দিয়ে মন্দ নামে অভিহিত করেছে। যেমন মক্কার মুশরেকীনরা প্রিয় নবী (সা.)-কে বিভিন্ন অপবাদ দিয়ে কেউ বলেছিল, 'যাদুকর', কেউ বলেছিল, গণক, কেউ বলেছিল, 'কবি', কেউ বলেছিল 'পাগল', কেউ বলেছিল 'বিকার গ্রস্ত', আবার কেউ বলেছিল, 'মিথ্যারচনাকারী মিথ্যক' ইত্যাদি। অথচ তিনি এ সব অপবাদ থেকে পবিত্র ছিলেন। আল্লাহ বলেছিলেন,

انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا

অর্থাৎ, দেখ ওরা তোমার জন্য কি উপমা দেয় ফলে ওরা পথ ভ্রষ্ট হয়ে গেছে এবং ওব্রা পথ পাবে না। (সূরা ইসরা ৪৮ আয়াত)

তদনুরূপ আহলে সুন্নাহ বা সালাফীগণও যাবতীয় অপবাদ থেকে পবিত্র। যেহেতু তারা উজ্জ্বল সুন্নাহ, সন্তোষজন চরিত্র, সরল পথ এবং শক্ত, চুড়ান্ত ও অকাট্য দলীলের ধারক ও বাহক। আল্লাহ আয্যা অজাল্ল যাদেরকে তাঁর কিতাব ও অহীবাণীর অনুসরণ এবং তাঁর রসুলের চরিতাদর্শের অনুকরণ করার তওফীক ও প্রেরণা দান করেছেন। যারা তাঁর অনুকরণে মানুষকে সৎকথা ও কাজের নির্দেশ এবং অসৎ কথা ও কাজে বাধা দান করে থাকে এবং জীবনের প্রতি মুহূর্তে তাঁরই চরিত ও সুন্নাহর অনুসারী থাকে। যাদের বক্ষ তাঁর প্রেমে এবং তাঁর শরীয়তের ইমামগণ ও তাঁর উম্মতের উলামাগণের মহব্বতে সদা প্রশস্ত। আর যারা যে জাতিকে ভালোবাসে তারা কিয়ামতে তাদেরই সঙ্গী হবে। (ই'তিকাদু আহলিল হাদীস)।

(৪) পুর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, বিআতীদের আমল রহিত, যেহেতু দ্বীন পুর্ণাঙ্গ এবং যে কাজে কিতাব বা সুন্নাহর কোন নির্দেশ নেই তা করা ভ্রষ্টতা এবং এর পরিণাম জাহান্নাম। বিদআতীদের নিরর্থক মেহনত এবং বেকার কর্মকান্ডের কোন পারিশ্রমিক, প্রতিদান ও সুফল নেই। আল্লাহ জাল্লা শানুহ বলেন,

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا)103 (الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا

অর্থাৎ, বল আমি কি তোমাদেরকে তাদের সংবাদ দেব, যারা কর্মে (আমলে)। বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত? ওরাই তারা, পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা পন্ড হয়, যদিও তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করছে। (সূরা কাহফ ১০৩-১০৪ আয়াত)

(৫) যে বিদআত করলে মানুষ কাফের হয়ে যায় সেই বিদআতের বিদআতী এবং তার প্রতি আহবানকারী বিদআতীর রেওয়ায়াত (হাদীসের বর্ণনা) গ্রহণ যোগ্য নয়। যেমন, তার সাক্ষিও অগ্রহণযোগ্য।

(৬) অধিকাংশ ফিতনার পশ্চাতে কোন না কোন বিদআতীর হাত থাকে এবং বিদআতীরাই বেশীরভাগ ফিতনায় আপতিত হয়ে থাকে। তাদের কারণে ভয়াবহ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। এমন ফিতনার সৃষ্টি হয় যাতে বহু মানুষ সন্ধ্যায় মুমিন থাকে, সকালে কাফের হয়ে যায় এবং সকালে মুমিন থাকলে, সন্ধ্যায় কাফের হয়ে যায়। সামান্য পার্থিব স্বার্থের বিনিময়ে এরা দ্বীনকে বিক্রয় করে দেয়। বিদআতই দ্বীন ও সমাজের বড় ফিতনা।

শরীয়তের পছন্দমত যে সব নফল (বাড়তি) কাজের নির্দেশ আছে। তা করলে তো আল্লাহ খুশীই হন। কিন্তু তাঁর নির্দেশ ও পছন্দের বাইরে নিজের মনগড়া কিছু করতে চাইলে অবশ্যই বঞ্চনা ও লাঞ্ছনা ছাড়া কিছুই লাভ হয় না। আবার তাঁর নির্দেশ অমান্য করে অতিরিক্ত অন্য কিছু করে মহব্বত প্রকাশ করতে চাইলে জাহেল হাবীব এটাই বুঝে যে, সে তার মাহবুব ও শরীয়ত অপেক্ষা অনেক বেশী বুঝে। আবার এতটা বলতে দুঃসাহস করে যে, শরীয়ত তো একটা পিয়াজের মত যার সবটাই খোসা (ছাল)! অর্থাৎ যার সার ও আসল কিছুই নেই !! শরীয়তের আলেম ও অনুগামীরা তো কেবল পানারী পাতার মত; যা পানির গভীরতার উপরেই ভেসে বেড়ায় ইত্যাদি!!! এ ধরনের ছন্নছাড়া, বাঁধনহারা মহব্বতের দাবীদারদের অবস্থা যে কি হবে, তা জ্ঞানীদের নিকট সহজেই প্রতীয়মান। বিদআতীদের এমন অনেক মানুষ আছে যারা বিদআতকে অন্তর্মূলে স্থান দেয় না, তবে তা ভালো জেনে এবং তাতে আল্লাহ খুশী হবেন এই মনে করে লোকের দেখাদেখি সাধারণভাবে তা করে থাকে। কিন্তু তার বিপরীত কোন দলীল বা নীতিকথা শুনলে উদার মনে তা পরিত্যাগ করে প্রকৃত দ্বীনকে হীন সেবকরূপে ধরার চেষ্টা করে এবং বিদআত হতে তওবা করে। অবশ্যই তারা পথপ্রাপ্ত এবং তাদের জন্যই মুক্তি।

বাংলাদেশে শির্ক ও বিদ'আতের ভয়াবহতাঃ

বাংলাদেশ ইসলামের মূল ভূখণ্ড মাক্কাহ মুকাররামাহ ও মদীনা মুনাওয়ারাহ হতে অনেক দূরে অবস্থিত। ইসলাম এই ভূখণ্ডে প্রবেশ করার পূর্বে এই উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত এই ভূখণ্ডও বহু ঈশ্বরবাদী আকীদার লালনভূমি ছিল। ইসলামী জীবন ব্যবস্থা মূলত তাওহীদবাদী জীবন ব্যবস্থা। একত্ববাদকে কেন্দ্র করেই ইসলামী সংস্কৃতি আবর্তিত হয়। এই ভূখণ্ডের যারা এই জীবন ব্যবস্থাকে গ্রহণ করেছিলেন, মূলতঃ তারা ছিলেন অন্য ধর্মাবলম্বী। নিষ্কলুষ একত্ববাদ কেন্দ্রিক ইসলাম এই ভূখণ্ডের জনসাধারণ যখন গ্রহণ করেছিলেন তখন তারা সরাসরি বহু ঈশ্বরবাদী দর্শনকে নিজেদের মন-মস্তিস্ক থেকে সম্পূর্ণভাবে ঝেড়ে ফেললেও তাদের সমাজ-সামাজিকতা, আচার অনুষ্ঠান, কৃষ্টি-সভ্যতার সবকিছু বহু ঈশ্বরবাদী দর্শন মুক্ত হতে পারেনি।[1]

তাছাড়া এ ভূখণ্ডের অনেকেই তাদের পূর্ব পুরুষের ধর্ম পরিত্যাগ করে মুসলিমও হয়নি। সেজন্য তাদের বহু ঈশ্বরবাদী শির্ক এ ভূখণ্ডে ছিল বেশ জোরদার। সে জন্য বলা যায়, এখানের অনেকেই মুসলিম হলেও এ ভূখণ্ড শির্ক ও বিদআতী আকীদা বিশ্বাসের অক্টোপাশ হতে কখনো পরিপূর্ণ মুক্ত হয়নি। আমাদের সমাজে যে শির্কের ছড়াছড়ি পরিলক্ষিত হচ্ছে, তার একটা বড় অংশ আমাদের আশেপাশে বিদ্যমান এই বহু ঈশ্বরবাদ ও শির্কের প্রভাবেরই ফল। পারস্যের অগ্নি উপাসকদের ও হিমালয় উপমহাদেশের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে প্রচলিত শির্কের প্রভাবও এ অঞ্চলের মুসলিম সংস্কৃতিতে লক্ষণীয়। এক দিকে চারিপার্শ্বে বহু ঈশ্বরবাদী শির্ক আকিদা বিশ্বাস প্রভাবিত আচার আচরণ, সমাজ সামাজিকতা, নিয়ম পদ্ধতি; অপরদিকে মুসলিম বাদশাহদের পৃষ্ঠপোষকতায় পুরাতন যুগ থেকে বাংলাদেশের মুসলিম সমাজের একটা বড় স্থান শির্ক দখল করে নিয়েছে।[2]

বিশুদ্ধ ইসলামী জ্ঞানের স্বল্পতা, মানুষ হিসাবে স্বীয় মর্যাদার ব্যাপারে উদাসীনতা, পূর্ব পুরুষদের অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডের প্রতি অন্ধ অনুকরণ, ধর্মীয় ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে অতিরঞ্জন, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল, ভ্রান্ত ধারণার প্রতি অসচেতনতা প্রভৃতি কারণে বাংলাদেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এই শির্কের অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

১. মানুষকে বিধান প্রণয়নের উন্মুক্ত অধিকার প্রদান:
বাংলাদেশে যে সব শির্ক লালন হচ্ছে, এটি তন্মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য শির্ক। কেননা চলার পথ পদ্ধতি, নিয়ম-নীতি, অন্য কথায় বিধান প্রণয়নের অধিকার ইসলামে মহান আল্লাহর জন্যই সংরক্ষিত। ইসলামের দৃষ্টিতে এ বিষয়ে অন্য কারো সামান্য নাক গলানোর অধিকার নেই। উদাত্ত কণ্ঠে এরশাদ হল:

﴿أَلَا لَهُ ٱلۡخَلۡقُ وَٱلۡأَمۡرُۗ ٥٤ ﴾]الاعراف :٥٤[

সাবধান! সৃষ্টি যার, নির্দেশ দানের একমাত্র অধিকারও তার।[1] সুতরাং শরীয়াত প্রণয়নে অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ অথবা অন্য কাউকে এ বিষয়ে সামান্য অধিকার দান শির্কের অন্তর্ভুক্ত।

যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে সার্বিক বিধান প্রণেতা মেনে নেয়, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

﴿أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمۡ يَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُۚ﴾]الشورى :٢١[

"তারা কি আল্লাহর এমন কিছু অংশীদার তৈরী করে নিয়েছে, যারা তাদের জন্য সেই জীবন ব্যবস্থা প্রণয়ন করে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?"[2]

আল্লাহকে বাদ দিয়ে মানুষকে বিধান প্রণয়নের এই শির্ক চর্চা আমাদের মুসলিম জনপদকেও গ্রাস করে বসেছে। সংসদকে আল্লাহর বিধান বিরোধী বিধান প্রণয়নের অধিকার দানও এই শির্ক চর্চারই শামিল। আল্লাহ'র হারামকৃত সুদ এখানে বৈধ, মদ এখানে পরিপূর্ণভাবে অবৈধ নয়, বেশ্যালয়ের লাইসেন্স পাওয়াও আইনগত বাধা নেই, ইত্যাদি অসংখ্য কাজ- যা আল্লাহ হারাম করেছেন, তা আজ এখানে বৈধ করে রাখা হয়েছে।[3]তবে দুনিয়ার যে সকল বিষয়ে সরাসরি আল্লাহ বিধান দেন নি, সেগুলোতে যদি শরীয়ত বিরোধিতা না থাকে তবে তা প্রণয়ন করাতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু মানুষ আল্লাহর বিধানকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে শরীয়ত বিরোধী মানুষের তৈরী বিধানকে নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করছে, যা নিঃসন্দেহে শির্ক ও কুফরী।

[1] . সূরা আল- আ'রাফ: ৫৪। [2] . সূরা আশ-শুরা: ২১। [3] . সূরা আত-তাওবার ৩১ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় এ বিষয়ের হাদীসসমূহ দেখুন, আল-কুরতুবী, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ, আল-জামি' লি আহাকামিয়া কুরআন, দারুল ইহইয়া লিত-তুরাছিল আরাবী, বৈরুত, ১৯৮৫, ৮খ, পৃ. ১১৯-১২০; আত-তাবারী, ইবন জারীর, জামি'উল বায়ান ফী তা'বীলি আয়িল কুরআন, দারুল-কুতুবিল ইসলামিয়্যা, বৈরুত, ১৯৯২, ৬খ, পৃ. ৩৫৩-৩৫৬।

২. জ্যোতিষ বিদ্যা ও ভাগ্যগণনা:

আমাদের দেশে মানুষ ভবিষ্যত ভালো মন্দ জানার জন্য ভাগ্য গণনা করতে জোতিষবিদ ও গণকের কাছে গমন করে। অথচ অদৃশ্য বস্তু ও ভবিষ্যত বিষয় জানা একমাত্র আল্লাহ সুবাহানাহু তা'আলার জন্যই নির্ধারিত, আল্লাহ বলেন:

قُل لَّا يَعۡلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ ٱلۡغَيۡبَ إِلَّا ٱللَّهُۚ]النمل :٦٥[

আপনি বলুন, একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আসমান ও যমীনের কেউ অদৃশ্যের সংবাদ জানেন না।[1]

অন্য কেউ এ বিষয়ে জানার দাবী করা, বা জানার চেষ্টা করা, মুলত: আল্লাহর সংরক্ষিত অধিকারকে খর্ব করার শামিল, যা মুলত: শির্কেরই অংশবিশেষ। আমাদের দেশে জ্যোতিষ বিদ্যা, রাশি নির্ণয়, ভাগ্য গণনা, পাখীর মাধ্যমে ভাগ্য পরীক্ষার নামে যে সকল কাজ কর্মের ছড়াছড়ি পরিলক্ষিত হয়, তা ভবিষ্যত জানারই অপচেষ্টা মাত্র। এটি মুলত: শির্ক। বড় বড় সাইন বোর্ড টাঙিয়ে ভাগ্য গণনা ও রাশি নির্ণয়ের জন্য প্রতিষ্ঠান খোলা হয়েছে। পত্রিকায় ঘটা করে রাশি নির্ধারণপূর্বক ভবিষ্যতবাণী করা হয়। কোথাও ভাগ্য নির্ধারণের জন্য যন্ত্রও বসানো হয়েছে। শহরের রাস্তাঘাটে পাখি দিয়েও ভাগ্য নির্ধারণের মিথ্যা অপচেষ্টা চলে। এ বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী অত্যন্ত পরিস্কার, তিনি বলেন:

«من أتى عرافا فسأله عن شيء، لم يُقبل له صلاة أربعين ليلة»

যে ব্যক্তি কোনো গণকের কাছে আসে এবং তাকে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে, ৪০ দিন পর্যন্ত তার কোনো সালাত কবুল হয় না।[2]

عن ابى هريرة رضى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم

যে ব্যক্তি জ্যোতিষীর কাছে আসলো এবং সে যা বলল তা সত্য মনে করলো, সে মূলত: মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা অবিশ্বাস করলো।”[3]

এর অর্থ হচ্ছে সে কাফির। আর তা এ জন্য যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি নাযিল হয়েছে যে, গায়ব কেবলমাত্র আল্লাহ ই জানেন। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে:

﴿ قُل لَّآ أَقُولُ لَكُمۡ عِندِي خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمۡ إِنِّي مَلَكٌۖ إِنۡ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَيَّۚ قُلۡ هَلۡ يَسۡتَوِي ٱلۡأَعۡمَىٰ وَٱلۡبَصِيرُۚ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ٥٠ ﴾]الانعام :٥٠[

বল, আমি বলছি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ভাণ্ডারসমূহ রয়েছে, আমি গায়েবও জানি না। আমি তোমাদের এ কথাও বলছি না যে , আমি একজন ফেরেশতা। আমি অনুসরণ করি শুধু তাই যা আমার কাছে ওহী হয়ে আসে।[4]নির্দিষ্ট তারকা নির্ধারিত স্থানে উদিত হলে তার প্রভাবে এই এই কল্যাণ বা অকল্যাণ হতে পারে, নির্ধারিত মৌসুমের প্রভাবে বৃষ্টি বা ঝড় হতে

পারে[5] প্রভৃতি যে সব কথা বার্তা আমাদের সমাজে অহরহ প্রচলিত রয়েছে তা পূর্বোল্লেখিত শির্কেরই অংশ বিশেষ।

[1] . সূরা নামল: ৬৫। [2] . আল-ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আন-নিসাপূরী, সহীহ মুসলিম, আল-মাকতাবুল ইসলামিয়াহ, ইসতাম্বুল, তা.বি, ৪ খ, পৃ. ১৭৫১। [3] . আবু দাউদ, সোলাইমান ইবন আশ'আছ, সুনান আবী দাউদ, দারুল জীল, বৈরুত ১৯৯২, ৪খ, পৃ. ১৪। [4] সূরা আল আনআম:৫০। [5] . প্র প্রসঙ্গে বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে:

৩. জাদু:

পৃথিবীতে আল্লাহ মানুষের কল্যাণেই সব কিছুর নিয়মনীতি নির্ধারণ করেছেন। আগুন পোড়ানোর কাজে ব্যবহার হয়। পানি সব কিছু ভিজিয়ে দেয়, বাতাস গাছপালাকে দোলা দেয়, এগুলো আল্লাহরই নির্ধারিত নিয়মনীতি। এ ক্ষেত্রে কোনো কিছুর ব্যতিক্রম হলেই মানুষের মনে প্রশ্ন সৃষ্টি হয়। যেমন- আগুন ছাড়াই যখন কেউ কোনো কিছু পুড়তে দেখবে তখন কেন পুড়ছে? এ প্রশ্নটি স্বাভাবিক। তখন মনের ভিতরে পোড়ার কারণ নিয়েই তোলপাড় শুরু হয়। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, তিনি আগুনকে পোড়ানোর গুণ দিলেও আগুন ছাড়াই কোনো কিছু পোড়ানোর একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী কিন্তু তিনিই। নির্ধারিত নিয়ম লংঘন করে কোনো কিছু সংঘটিত হলে এটি কার দ্বারা হলো, যার প্রভাবে হলো তার সুত্র উদ্ধার করার একটি পর্যায় আমরা যখন আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কিছুকে তার স্থানে বসাই, তখনই অলক্ষ্যেই শির্কের অনুপ্রবেশ ঘটে। যেমন ঔষধ ধরা যায়, স্পর্শ করা যায়, অনুভব করা যায়। আল্লাহ একে রোগ সারানোর গুণাগুন বা ক্ষমতা দান করেছেন। জাদু ধরা যায় না, স্পর্শ করা যায় না, তারপরেও এর গুণাগুন যখন মানুষের উপর প্রভাব ফেলে তখনই এই অদৃশ্য বস্তর প্রভাব ও ক্ষমতা নিয়ে মানুষের মনে সৃষ্টি হয় বিভিন্ন তোলপাড়, যার অনিবার্য পরিণতিতে আল্লাহতো বটেই এমনকি জাদুরও যথেষ্ট ক্ষমতা রয়েছে, এই ধারণা মানুষের মনে বদ্ধমূল হয়, যা মূলত: শির্কের নামান্তর। সে জন্য ইসলামে জাদু কঠোর ভাষায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজের মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাদুকেও উল্লেখ করেছেন।

عن ابي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع المو بقات قالوا يارسول الله وما هن؟ قال الشرك يالله والسحر---

সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে বাঁচো। তারা বলল- সেগুলো কি কি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, শির্ক ও জাদু ....।[1]

জাদুকরদের কাছে কোনো রোগের চিকিস্যা বা সমস্যা সমাধানের আশ্রয় গ্রহণকেও ইসলাম সম্পূর্ণ হারাম করে দিয়ছে। শুধু তাই নয়, কুরআন মাজীদ আমাদের শিক্ষা দিয়েছে জাদুকরদের

দুষ্কৃতি ও ক্ষতি থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাওয়ার। মহান আল্লাহ বলেন, “বলো, ... ফুঁ দিয়ে গিরে কসে বাঁধে যেসব নারী, তাদের দুষ্কৃতি ও ক্ষতি থেকে, হে আল্লাহ তোমার কাছে পানা চাই।”

জাদুতে রয়েছে শির্কী কথাবার্তা। জাদু যার জন্য করা হয়, তাকেও শির্ক করতে বাধ্য করা হয়। সেজন্য জাদু শির্কেরই অংশ। বাংলাদেশে জাদু শিক্ষার প্রতিষ্ঠান রয়েছে। পত্রিকায় এ বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। জাদু দ্বারা অসংখ্য সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয়। অনেকেই জাদুকর নামেই খ্যাতি অর্জন করেছে।

1] . আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, ৭খ, পৃ. ৩৫০।

৪. কবর পূজা:
ইসলাম কবরের পবিত্রতা রক্ষা ও মৃত্যুকে স্মরণ ও মৃত ব্যক্তির জন্য মাগফিরাত কামনা বৈধ মনে করে। তবে কবরে সিজদাহ, মানত, স্পর্শ করে বরকত হাছিল, চুমুদান, প্রদীপ জ্বালান, প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শন প্রভৃতিকে ইসলাম শির্কের অংশ মনে করে। কবর সম্পর্কে ইসলামের বাণী অত্যন্ত পরিস্কার। বর্ণিত হয়েছে:

عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর পাকা করতে, তার উপর বসতে এবং তার উপর ঘর বানাতে নিষেধ করেছেন।[1]
[1] . আবু-দাউদ, প্রাগুক্ত, ৩ খ, পৃ. ২১৩।

৫. প্রদর্শনেচ্ছা: কাউকে খুশী করা, কারো প্রশংসা বা বাহ বাহ কুড়ানোর জন্য অনেকেই অনেক ভাল কাজ করে থাকে। ইসলামের দৃষ্টিতে ছাওয়াবের নিয়তে যে কোনো ভাল কাজ করা ইবাদতেরই অংশ। আর ইবাদত পাওয়ার একমাত্র যোগ্য সত্তাই হচ্ছেন, মহান রাব্বুল আলামীন। যে জন্য যে সকল ভাল কাজের সামান্য হলেও প্রদর্শনেচ্ছা বিদ্যমান থাকে, তা মূলত: পরিপূর্ণভাবে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয় না বরং অন্যকে খুশী করা, অন্যের থেকে প্রশংসা পাওয়া প্রভৃতি উদ্দেশ্য সেখানে কিঞ্চিত হলেও থাকে বলে প্রদর্শনেচ্ছা জড়িত যে কোনো কাজই শির্কের অন্তর্ভুক্ত। এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সুন্দর উদাহরণ উপস্থাপন করে বলেন:

الا أخبر كم بما هو اخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى قال الشرك الخفى يقوم الرجل فيصلى فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل.

আমি কি এক চোখ বিশিষ্ট দাজ্জালের চেয়ে আরো ভয়াবহ একটি বিষয়ে তোমাদেরকে সংবাদ দেব না? সাহাবীগণ বললেন- হ্যাঁ, তিনি বললেন, ‘তা হচ্ছে গোপন শির্ক।’ কোনো ব্যক্তি ছালাত আদায় করার জন্য দাঁড়াল আর তা অন্য মানুষের দৃষ্টিতে ভাল প্রমাণের জন্য সুন্দর করে আদায় করল।[1] অর্থাৎ নিজে সাধারণত: যে ভাবে ছালাত আদায় করা হয় অন্য কেউ তা দেখছে বিধায় তা আরো সুন্দর করে, আদায় করা, ছোট শির্কের অন্তর্ভুক্ত। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীসে কুদসীতে মহান আল্লাহ বলেন:

انا اغنى الأغنياء عن الشرك فمن عمل عملا لشرك فيه غيري تركته وشركه

আমি শির্কযুক্ত আমল (কাজ) থেকে মুখাপেক্ষীহীন। যে কেউ কোনো কাজ করল এবং তাতে আমার সাথে অন্যকে অংশীদার বানাল, আমি ঐ কাজ ও যাকে অংশীদার বানাল উভয়কেই বর্জন করি।[2] আমাদের সমাজে লোক দেখানোর জন্য দান করা, প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, অন্যের উপকার করা, হাজী বলা হবে বলে হজ্জ করা, খ্যাতির জন্য যে কোনো কাজ করা প্রভৃতি অনবরতই হচ্ছে। এ গুলো শির্কের অন্তর্ভুক্ত। কিয়ামতে এই কারণেই অনেক দানবীর, শহীদ ও আলিমকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[3]

[1] . ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, ৪খ, পৃ. ২২৮৯। [2]. ইবন মাজাহ্, মুহাম্মাদ ইবন য়াযীদ আল-কাযবিনী, সনান ইবন মাজা, রিয়াদ, ১৯৮৪, ২য় মুদ্রণ, ২খ, পৃ. ৪২৬। [3] . আত-তিরমিযী, আবু’ ঈসা মুহাম্মদ, সুনানুত, তিরমিযী, দারু ইহইয়াইত তুরাছিল ‘আরাবী’, তা.বি, ৪ খ, পৃ. ৫৯১-৫৯৩।

৬. আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের কাছে দো‘আ: ভাল-মন্দ, বাঁচা-মরা, সন্তান দান, চাকুরী পাওয়া, জান্নাত প্রাপ্তি, গোনাহ মাফ, এইসব কিছু দেওয়ার একমাত্র মালিক হচ্ছেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। সেজন্য এই সব চাওয়া বা এ সম্পর্কে অন্য কারো কাছে দো‘আ করাকে আল-কুরআনে কঠোর ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে- মহান আল্লাহ বলেন:

:وَلَا تَدۡعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَۖ فَإِن فَعَلۡتَ فَإِنَّكَ إِذٗا مِّنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ١٠٦ ﴾]يونس ﴿ ١٠٦]

আল্লাহকে বাদ দিয়ে যারা তোমার কোনো মঙ্গল বা অমঙ্গল করার ক্ষমতা রাখেনা তাদের কাছে কোনো কিছুর প্রার্থনা করবে না, যদি তুমি তা কর, তাহলে তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।[1]
[1] . সূরা ইউনুস: ১০৬।

৭. তাবীজ ব্যবহার: রোগমুক্তি, উদ্দেশ্য হাছিল, কারো কুনজর থেকে বেঁচে থাকা, প্রভৃতি কারণে আমাদের দেশে যে তাবীজ ঝোলানো হয়, তাও মূলত: এক প্রকার শির্ক। উকবাহ ইবন আমরের সূত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

ان الرقى التمائم والتولة من الشرك

নিশ্চয় মন্ত্র, তাবিজ ও যা স্ত্রীদেরকে তাদের স্বামীর নিকট প্রিয় করে তোলার জন্য নেওয়া হয়, তা ব্যবহার করা শির্ক।[1]

সমস্যা সমাধান, বিপদমুক্তি, রোগ থেকে আরোগ্য লাভ, উদ্দেশ্য হাছিল প্রভৃতি করতে আমাদের দেশে যে আংটি রিং, সুতা পড়া, গাছ বা তৃণের অংশ, কড়ি প্রভৃতি ঝুলানো হয় তা মুলত: এই শির্কেরই অন্তর্ভুক্ত।[2]
[1] .আহম্মদ ইবন হাম্বল, প্রাগুক্ত, ৪খ, পৃ. ১৫৪। [2] . ড. ছালিহ আল-ফাওযান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২।

৮. শুভ ও অশুভ বিশ্বাস: কোনো কাজ শুরু করতে, ভ্রমণে বের হতে, বিবাহ বা অন্যান্য অনুষ্ঠানে দিন নির্ধারণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে শুভ অশুভ দেখার প্রচলনও আমাদের দেশে রয়েছে। আগে পাখীর মাধ্যমে এই শুভ অশুভ নির্ধারণ হত। পাখী ডানের দিকে উড়ে গেলে শুভ, অন্যথায় অশুভ ধরে নেয়া হত। ইসলামের দৃষ্টিতে শুভ অশুভ নির্ধারণের এই পদ্ধতি এবং এর প্রতি ঈমান আনা শির্ক। কেননা এটি একদিকে আল্লাহর প্রতি মানুষের আস্থা ও তাওয়াকুলকে বিঘ্নিত করে, তেমনই মঙ্গল ও অনিষ্টতা করার অধিকার যে একমাত্র আল্লাহর, সে বিষয়ে সন্দেহের উদ্রেক করে। আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন তিন বার বলেন:

الطيرة شرك الطيرة شرك ثلاثا

পাখী উড়িয়ে শুভ অশুভ নির্ধারণ শির্ক।[1] আসলে মঙ্গল অমঙ্গল শুভ-অশুভ মহান আল্লাহরই বিষয়। কোনো সৃষ্টের মাধ্যমে তা নির্ধারণ মূলত: তাঁরই কর্তৃত্বে অন্যকে অংশীদার বানান হয়, সেজন্য এটি শির্ক। কাকের ডাক, যাত্রা পথে ভাঙা বা ছেড়া কোনো কিছু দেখা, কলা বা ডিম

খেয়ে পরীক্ষা দিতে যাওয়া, বন্ধ্যার মুখ দর্শন, খালী কলস দেখা প্রভৃতিকে অশুভ মনে করার যে প্রচলন আমাদের সমাজে রয়েছে তা শির্কেরই নামান্তর।

৯.বিবাহের ক্ষেত্রে যৌতুক গ্রহন: বর বা অন্যান্য মানুষের চাপে কনে পক্ষ থেকে বিভিন্ন জিনিসপত্র যেমন কনের জেওর, কাপড়, আসবাবপত্র ইত্যাদিসহ অতিরিক্ত টাকা গ্রহন বৈধ নয়। বরং এটি এক প্রকার জুলুম। এ ধরনের সংস্কৃতি হিন্দু সম্প্রদায়ের মাঝে দেখা যেত।

যদি বর বা তার গার্জিয়ানের পক্ষ থেকে এমন শর্ত করা হয় যে কনে বা তার গার্জিয়ানের পক্ষ থেকে হাদিয়া তুহফা বা টাকা-পয়সা ইত্যাদি উপঢৌকন না দিলে, উক্ত কনেকে বিবাহই করবে না, তাহলে শর্ত সাপেক্ষে কনের পক্ষ থেকে উক্ত জিনিসপত্র দেওয়া সুদ হিসেবে হারাম হবে। চাই তা নিজের দিক বা অন্য কারো কাছ থেকে নিয়েই দিক। কেননা বিবাহ বন্ধন হল এমন একটি বেচা-কেনা যেখানে বিনিময়ে কিছু পাওয়া যায় না। যেমন- অন্যান্য বেচা-কেনার টাকার বিনিময়ে কাপড়, ধান ইত্যাদি কোনো বস্তু পাওয়া যায়। তাই বিবাহ নামক বেচা-কেনার মধ্যে শরীয়তের দাবী (যেমন মহর ইত্যাদি) ব্যতীত যে কোনো পক্ষ থেকে টাকা-পয়সা দেওয়া ও নেওয়া ঘুষ হিসাবে হারাম হবে।

আর বিবাহের পূর্বে, মেয়ের পিতা ছেলের অসন্তুষ্টিতে, তার নিকট থেকে দাবীর মাধ্যমে যে টাকা গ্রহণ করে, তাও সুদ। হ্যাঁ ছেলের নিকট দাবী করা ব্যতীত সে সন্তুষ্টচিত্তে যদি দিয়ে থাকে তাহলে সেটা জায়েয হবে।

বিবাহ মজলিসে বরকে হাদিয়া তোহফার নামে বিভিন্ন জিনিস দেওয়ার যে রেওয়াজ রয়েছে, যদিও তা শর্ত ব্যতীত হোক না কেন, মাকরূহে তাহরিমী। যেমন মোল্লা আলী ক্বারী শরহে মেশকাতের মধ্যে স্পষ্ট ভাষায় তার বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

১০. আনুষ্ঠানিকতার নামে অপব্যয়: আনুষ্ঠানিকতার নামে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে কোটি কোটি টাকা খরচ করা হয়। তা অপব্যয়ের মধ্যে শামিল, আর অপব্যয় অকাট্য দলিলের দ্বারা হারাম প্রমাণিত। যেমন-মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّ ٱلۡمُبَذِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخۡوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِۖ وَكَانَ ٱلشَّيۡطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورٗا ٢٧ ﴾ [الاسراء: ٢٧]

“অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার প্রভুর অস্বীকারকারী।” মনের কুপ্রবৃত্তির সন্তুষ্টির জন্য টাকা-পয়সা খরচ করা এবং গোনাহের কাজে খরচ করা অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।

অনেক জায়গায় বরের বাড়ী থেকে, কনের বাড়ীতে, আবার কনের বাড়ী থেকে, বরের বাড়ীতে মেহেন্দি পাঠানো হয় এবং অপরিচিত বা পরিচিত গায়রে মুহরেম মেয়ে বরের হাত ধরে মেহেন্দি লাগায়। যা সম্পূর্ণভাবে হারাম। এ সমস্ত মানুষের আমালনামায় জেনার গোনাহ লেখা হবে। তাছাড়া গান গাওয়া ও বাদ্য বাজানো সম্পূর্ণ হারাম। বস্তুত: গান বাদ্য নেফাক সৃষ্টি করে এবং খাহেশ বৃদ্ধি করে। এ ব্যাপারে অনেক হাদীস হাদীসের কিতাবে বিদ্যমান।

জানা আবশ্যক, বিবাহকারী উভয়পক্ষে সমস্ত কথাবার্তা ঠিক হওয়ার পর প্রয়োজনে কনেকে অতি গোপনীয়তা অবলম্বনের মাধ্যমে দেখে নিতে পারে। দেখার ব্যাপারটি সমাজে প্রকাশ করা ঠিক নয়। কারণ, হতে পারে কোনো অসুবিধায় বিবাহ নাও হতে পারে। কিন্তু এ দেখাকে উপলক্ষ্য করে অন্য পাত্র উক্ত মেয়ের জন্য আসতে চাইবে না। তাতে মেয়ের গার্জিয়ানের অনেক কষ্ট পেতে হয়। দ্বিতীয় জায়গায় বিবাহ দেওয়ার ব্যাপারে খুব বুঝা দরকার। নির্ধারিত বর ব্যতীত অন্য যে কোনো পুরষ উক্ত মেয়েকে দেখতে পারবে না। কারণ, তখন তিনি ঐ মেয়ের জন্য গায়রে মুহরেম। বেশীর পক্ষে এতটুকু করা যেতে পারে বরের কোনো মুহরেম মেয়ে মাতা, বোন বা ফুফু ইত্যাদি মেয়েদেরকে, অতি গোপনে কনের বাড়ী পাঠিয়ে দেখে নিতে পারে। তাও আবার বিবাহের পূর্বে সমাজে প্রকাশ করা ঠিক হবে না।

বরকে গোসল দেওয়ার সময় কতগুলি হিন্দুয়ানী রুছুম করা হয়। যেমন- কুলা ইত্যাদিকে সাজিয়ে এর মধ্যে মোমবাতী জ্বালানো, ধান, হলুদ ইত্যাদি দেওয়া সবই নাজায়েয এবং গোনাহের কাজ। আবার কনেকে বরের বাড়ী নিয়ে নামানোর পূর্বে অজ্ঞ মানুষেরা কিছু রুছুমাত করে থাকে। যেমন- কনের নামনে পানি রাখা, কলসি রাখা ইত্যাদি সবই নাজায়েয এবং হিন্দুদের তরিকা-

বিবাহের মধ্যে আরো একটি কুসংস্কার হল কনের নিকট থেকে এজাযত নেয়ার সময় কয়েকজন গায়রে মুহরেম পুরুষও অলির (গার্জিয়ানের) সাথে থাকে। যা ঠিক নয় এবং এর প্রয়োজনও নেই।

কেননা ফিকহ শাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য কিতাবের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে এজাযত নেওয়ার নিয়ম রয়েছে। আর তা হলো, কনে যদি বালেগ হয়ে থাকে তাহলে তার ওলি (পিতা, ভাই অথবা দাদা) যিনি হবেন, তিনি তাকে শুধু শুধিয়ে দিবেন যে, আমি তোমাকে অমুকের ছেলে অমুকের নিকট এত টাকার (মাহরের) বিনিময়ে বিবাহ দিতে চাই। এটা শ্রবণে কনে যদি কাঁদে, হাসে বা চুপ করে থাকে তাহলে তা সন্তুষ্টি হিসেবে ধর্তব্য হবে। উক্ত অবস্থায় সাক্ষীর কোনো প্রয়োজন নেই। বিবাহ সম্পাদনের সময় শুধু সাক্ষীর প্রয়োজন। সাক্ষী ব্যতীত বিবাহ সম্পাদন হবে না। আর

যদি কনে নাবালেগই হয়, তাহলে তার এজাযত ব্যতীতও তার পিতা অথবা দাদা বিবাহ দিতে পারে।

আরো একটি কুসংস্কার হল, কনেকে শ্বশুরালয়ে নিয়ে যাওয়ার পর ঘরে প্রবেশের সময় বর এবং কনে উভয়েই কাঁচা মাটিতে পা রেখে প্রবেশ করতে হয়। শরীয়তে এ সমস্ত কাজের কোনো ভিত্তি নেই। এছাড়াও উভয়ের কাপড়ের মধ্যে গিরা লাগানো হয়। দাম্পত্য জীবনে মিল মুহব্বত নাকি ইত্যাদি সুবিবেক বিরোধী কাজের উপর নির্ভর করে। ধিক এ সকল অজ্ঞতার উপর। এগুলো সবই বিধর্মী ও হিন্দুয়ানী প্রথা বৈ কিছু নয়। কেউ মূর্খ সমাজের চাপে, আবার কেউ আত্মীয়তার আবদার বজায় রাখার জন্য করে। ধর্মীয় সুষ্ঠ ও সুন্দর নিয়মের মোকাবেলায় এ সমস্ত কুসংস্কার ও বিবেক বিরোধী কাজের কোনো স্থান নেই। আল্লাহ সকলকে ধর্মের সঠিক বুঝ নছিব করুন এবং ধর্মীয় নির্ধারিত বিধান সঠিকভাবে পালন করার তাওফিক নছিব করুন।

শির্ক ও বিদআত নির্মূলে করনীয়ঃ

১.শির্ক অপসংস্কৃতির ভয়াবহতা সম্পর্কে সকলকে সচেতন করে তুলতে হবে।

২.আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ এমনভাবে সতকর্তা অবলম্বন করতে হবে যাতে ঈমান বিধ্বংসী এ সব শির্কী সংস্কৃতি আমাদেরকে স্পর্শ না করতে পারে।

৩.শির্ক অপসংস্কৃতি বিষয়ে লেখা, বক্তৃতা, সেমিনার ও সিম্পেজিয়ামের বেশি বেশি ব্যবস্থা হওয়া খুবই জরুরী।

৪.কুরআন ও বিশুদ্ধ সুন্নার আলোকেই শির্ক অপসংস্কৃতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ প্রয়োজন, অন্যকোন মাধ্যম থেকে বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়।

৫.এই শির্ক অপসংস্কৃতি রোধে সাহিত্য ও সংস্কৃতিমনা, বক্তা, খতীব ও লেখকদেরকে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে হবে।

৬.দেশের প্রতিষ্ঠানসমূহে শির্কের উপর বিস্তারিত পাঠ গ্রহণের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৭. আলকুরআনে বর্ণিত সমস্ত কথা ও কাজকে নিঃসন্দেহে ও নিঃসংকোচে বিশ্বাস ও ধারণ করা (যে কুরআনে) পূর্ববর্তী কোন প্রকার মিথ্যা ও বাতিল প্রক্ষিপ্ত হয় না।

৮. সহীহ সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা, যা আল-কুরআনের ব্যাখ্যাতা ও দ্বিতীয় ওহী (ঐশীবাণী)। যেমন মহান আল্লাহ বলেন

((وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ,

অর্থাৎ, তোমার প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করা হয়েছে তা তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বোঝাবার জন্য--। (সূরা নাহল ৪৪ আয়াত)

তিনি অন্যত্র বলেন,

((وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى

অর্থাৎ, এবং সে (নবী) নিজের ইচ্ছামত কোন কথা বলেন না। তা তো অহী, যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়। (সূরা নাজম ৩-৪ আয়াত)

৯. আল্লাহকে একমাত্র প্রতিপালক, সৃষ্টিকর্তা, বিধায়ক এবং একমাত্র উপাস্য ও মা'বুদরূপে বিশ্বাস করা। তিনি ছাড়া আর কেউই (সত্য) উপাস্য নেই। গুপ্ত ও প্রকাশ্য বিশ্বাস্য, কথনীয় এবং করণীয় যাবতীয় ইবাদত কেবল তাঁরই সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্যলাভের উদ্দেশ্যে তাঁকেই নিবেদন করা।

১০. তাঁর সমূদয় আসমা ও সিফাত (নাম ও গুণাবলী)র উপর সেই মত ঈমান রাখা, যে মত তিনি তাঁর কিতাবে নিজে বর্ণিত ও ব্যক্ত করেছেন এবং যে মত তাঁর রসূল তাঁর সুন্নাহতে বর্ণনা দিয়েছেন। তার স্পষ্ট অর্থ ও সহজার্থ গ্রহণ করা এবং কোন প্রকার বিকৃতি, হেরফের বা দূর ব্যাখ্যার অনুপ্রবেশ না ঘটানো। অথবা সেই সমূহকে অর্থহীন কিংবা আল্লাহ জাল্লাহ তাআলার ঐ অর্থবহগুণহীন না মনে করা এবং ঐ অর্থের বা গুণের কোন প্রকার উপমা, উদাহরণ, সাদৃশ্য বা স্বরূপতা বর্ণনা না করা। বরং তা কেমন, কি প্রকার, কিরূপ ইত্যাদি প্রশ্নও মনে না আনা। মহান আল্লাহ বলেন,

( ) لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

অর্থাৎ, কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (সূরা শূরা ১১ আয়াত)

১১. আল্লাহ পাক যা অবতীর্ণ করেছেন তা নিজেদের এবং রাষ্ট্রের (জীবন) সংবিধান করা এবং রসূল-এর আদর্শ ও বিধান দ্বারা সকল সমস্যার ও বিপদ-বিসম্বাদের ও বিচার-মীমাংসা করা। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ

() حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

অর্থাৎ, কিন্তু না, তোমার প্রতি পালকের শপথ! তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার-ভার তোমার উপর অর্পণ করে, অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নেয়। (সূরা নিসা ৬৫ আয়াত)

১২. সৎকার্যের আদেশ এবং অসৎ বাধা দান করা এবং সৎপথের প্রতি মানুষকে আহবান করা। আল্লাহ পাক বলেন,

(قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

অর্থাৎ, বল, এটিই আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীগণ সজ্ঞানে আল্লাহর প্রতি (মানুষকে) আহবান করি, আল্লাহ মহিমান্বিত এবং যারা আল্লাহর অংশী স্থাপন করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই। (সুরা ইউসুফ ১০৮ আয়াত)

তিনি অন্যত্র বলেন,

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن (ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

অর্থাৎ, তুমি (মানুষকে) প্রজ্ঞা (যুক্তি) ও সদুপদেশ দ্বারা তোমার প্রতিপালকের পথে আহবান কর এবং ওদের সাথে সদভাবে আলোচনা কর। অবশ্য তোমার প্রতিপালক। তাঁর পথ ছেড়ে যে বিপথগামী হয়; সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং যারা সৎপথে আছে তাও তিনি সবিশেষ জানেন। (সূরা নাহল ১২৫ আয়াত)

অতএব সৎকার্যের আদেশ ও অসৎকার্যে নিষেধ এবং আল্লাহর পথে আহবান (তবলীগ) এই দুটি আয়াতের ভিত্তিতে করা। প্রথমতঃ ইল্ম বা শরয়ী জ্ঞান ও দ্বিতীয়তঃ হিকমত বা প্রজ্ঞা বা

যুক্তি ও দূরদর্শিতা। প্রত্যেক মুসলিম তার সম্বল ও সামর্থ্যানুযায়ী নিজের নির্দিষ্ট ক্ষেত্র ও কর্মসীমার ভিতরে এই দাওয়াত কার্যে অংশ গ্রহণ করবে। আর আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের অতীত দায়িত্বভার অর্পণ করেন না। যেমন তাঁর রসূল বলেন, "তোমাদের মধ্যে যে কেউ কোন মন্দ কাজ দেখবে সে তার হাতের দ্বারা অপসারণ (বাধা দান) করবে। যদি তাতে সক্ষম না হয় তবে তার জিভের দ্বারা, যদি তাতেও সক্ষম না হয় তবে তার অন্তর দ্বারা (ঘৃণা জানবে) এবংতা দুর্বল ঈমানের পরিচায়ক। (মুসলিম)

সুতরাং হস্ত দ্বারা বাধা দেওয়া শাসন কর্তৃপক্ষের কর্তব্য এবং অনুরূপভাবে পরিবারের জন্য তার অভিভাবকের কাজ। মুখ দ্বারা বাধা দেওয়া প্রত্যেক মুসলিমের কাজ। যদি কথার সাহায্যেও গর্হিত কর্ম দূর করতে (ফিতনা ইত্যাদির ভয়ে) সক্ষম না হয়, তাহলে তার উচিত অন্তর থেকে ঐ মন্দকে ঘৃণা করা; নচেৎ ঈমান হারিয়ে যায়।

১৩. দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে এবং মানুষকে মানুষ অথবা জড়ের ইবাদত করা হতে রক্ষা করে একমাত্র মানুষ ও জড়ের সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক একক উপাস্যের ইবাদত করতে পথ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আল্লাহর পথে সর্বপ্রকার জিহাদ করা।

১৪. কারো প্রতি বন্ধুত্ব বা বিদ্বেষ কিতাব ও সুন্নাহর নির্দেশমত করা (কোন দল বা ব্যক্তিত্বের খাতিরে নয়।) আহলে সুন্নাহ বা হাদীসকে ভালোবাসা এবং আহলে বিদআতকে ঘৃণা করা।

১৫. প্রথমে সংশোধন ও তরবিয়তের, অতঃপর সংগঠন ও রচনার পথ অনুসরণ করা।

১৬. কুরআন ও সহীহ হাদীসের প্রতিকূল কোনও বক্তার ব্যক্তিপূজা না করা। এই দুয়ের উপর কোন ইমাম, আলেম বা চিন্তাবিদের কথাকে প্রাধান্য না দেওয়া, এ দুয়ের পরিপন্থী সকল মত ও সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করে একমাত্র এ দুয়েরই অনুসরণ করা।

১৭. নেতা, আমীর বা রাজার আনুগত্য করা; যদি তারা কোন পাপ কার্য্যের আদেশ না দেয় এবং স্পষ্ট সপ্রমাণ কুফরীর প্রকাশ ছাড়া তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা না করা।

১৮. সংখ্যায় কম হলেই পথ চলতে আতঙ্কিত ও ভীত না হওয়া। কেবল মাত্র হক ও দলীলের সাথে সম্মত হওয়া; যদিও বা সারা দুনিয়া বিরোধী হয়।

১৯. দ্বীনের যাবতীয় আদর্শ ও শিক্ষায়, ব্যবহার ও আচরণে পরস্পর সহানুভূতিশীল হওয়া। সকলে মিলে যেন একটি দেহ; যার কোন একটি অঙ্গ ব্যথিত হলে জাগরণ ও জ্বরে সারা দেহ

সমব্যথী হয়। যেমন রসূল-এর চরিত্র ছিল আল-কুরআন, তদনুরূপ ছিলেন তাঁর সাহাবাবৃন্দ যাঁরা আমাদের আদর্শ ও সলফ।

আল্লাহ আমাদের সকলকে শির্ক ও বিদ'আত থেকে মুক্ত হওয়ার তাওফীক দিন। (আমীন)

আমি আমার মুসলিম ভাই বোন যারা কিছু বিদ'আতকে ভালো মনে করে থাকে, চাই বিদ'আত আল্লাহর সত্ত্বার সাথে সম্পৃক্ত হোক বা নামের সাথে বা সিফাতের সাথে অথবা রাসূলুল্লাহর সম্মানের সাথে, তাদের প্রতি নসীহত করব, তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং যাবতীয় বিদ'আত থেকে বিরত থাকে। আর তারা যেন তাদের যাবতীয় কর্মসমূহকে ইত্তেবার ওপর ভিত্তি করে আমল করে, বিদ'আতের ওপর ভিত্তি করে নয় এবং তারা যেন তাদের যাবতীয় কর্মসমূহ ইখলাসের ওপর ভিত্তি করে আমল করে, শির্কের ওপর ভিত্তি করে নয়, সুন্নতের ওপর ভিত্তিতে করে আমল করে, বিদআতের ওপর ভিত্তি করে নয় এবং রহমানের মহব্বতের ওপর ভিত্তি করে, শয়তানের মহব্বতের ভিত্তিতে নয়। আর তারা যেন পরিণতির প্রতি লক্ষ্য করে, তাদের অন্তরে কি ধরনের প্রশান্তি, সজীবতা নিরাপত্তা, তৃপ্তি ও মহা নূর অর্জিত হয়।

আল্লাহর নিকট প্রার্থনা যে, তিনি যেন আমাদের হিদায়াতপ্রাপ্ত, হিদায়াতের মশালধারী এবং সংস্কারক ও তা নেতৃত্বদানকারী বানান। আর তিনি যেন, আমাদের অন্তরসমূহকে ঈমান ও ইলমের দ্বারা আলোকিত করেন। আর তিনি যেন আমাদের ইলমকে আমাদের জন্য বিপদের কারণ না বানান। আর আমি আরও প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন আমাদেরকে তার মুমিন বান্দাদের পথে পরিচালনা করেন এবং তার মুত্তাকী ওলীদের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং তার সফলকাম ও বিজয়ী দলের অন্তর্ভুক্ত করেন।

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين